সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

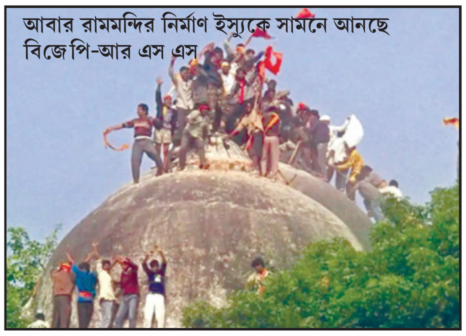

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর '১৮ ■ ৪৭তম বর্ষ ■ পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

আগামী ৮-৯ জানুয়ারি হবে ধর্মঘট

ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ পুনরায় বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে কর্মচারীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

কলকাতার খাদ্যভবনে কর্মচারীদের বিক্ষোভ কর্মসূচী

রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত অংশের শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষকদের জন্য গঠিত ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ আরো একবার ৬ মাসের জন্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। গত ৩১ অক্টোবর, বুধবার নবান্নের অর্থ দপ্তর থেকে প্রকাশিত একটি সরকারী আদেশনামার [নং ঃ ৬৭১৩-এফ (পি)/এফ এ/ও/২ এম/২৮৯/১৬ (এন বি)] মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। এর ফলে বেতন কমিশনের মেয়াদ বেড়ে দাঁড়াবে সাড়ে তিন বছর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে একাধিকবার বেতন কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ২৬ নভেম্বর ২০১৮, বেতন কমিশনের বর্দ্ধিত মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুনরায় মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে, আপাতত এর সুপারিশ প্রকাশ ও কার্যকরী করার কোন সম্ভাবনাই রইল না। শুধু তাই নয়, ৩১ অক্টোবরের আদেশনামা অনুযায়ী বর্দ্ধিত ৬ মাসের সময়সীমা শেষ হবে আগামী মে, ২০১৯-এ। যে সময়ে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ফলে ঐ সময় নির্বাচনী বিধি চালু থাকার ফলে, বেতন কমিশনের সুপারিশ যে প্রকাশ করা যাবে না, তা বলাই বাহুল্য। ফলত, একথা ধরে নেওয়াই যায় যে, মেয়াদ বৃদ্ধির খেলা এখানেই শেষ হবে না। অদূর ভবিষ্যতে নির্বাচনের দোহাই দিয়ে আবারও মেয়াদ বৃদ্ধি ঘটানো হবে, একথা নিঃশংসয়ে এখনই বলে দেওয়া যায়। বেতন কমিশন নিয়ে সরকারী টালবাহানার ফলে কর্মচারী মহলে এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, আদৌ বেতন কমিশন দিনের আলো দেখবে তো?

৩১ অক্টোবর সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই, হোয়াট্‌স্‌অ্যাপ, ফেসবুক প্রভৃতি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তা দ্রুত কর্মচারীদের মধ্যে ছড়িয়ে যায় এবং কর্মচারীদের ক্ষোভের পারদ চড়তে থাকে।

রাজ্যব্যাপী কর্মচারীদের ক্ষোভের সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১ নভেম্বর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আয়োজিত টিফিন বিরতির বিক্ষোভ সভাগুলিতে। এইদিন কলকাতাসহ রাজ্যের প্রতিটি জেলার সদরে, মহকুমা স্তরে এবং বহু ব্লকে আয়োজিত বিক্ষোভ সভাগুলিতে হাজার হাজার কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। জেলা সদরে জেলাশাসকের দপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরে এবং কলকাতায় নবমহাকরণ, মহাকরণ, কালেক্টরেট, বিকাশভবন, স্বাস্থ্যভবন, খাদ্যভবন, বাণিজ্যকর দপ্তর, টেকনিক্যাল এডুকেশন দপ্তরসহ বহু জায়গায় বিক্ষোভসভায় কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। রাজারহাটে টেকনিক্যাল এডুকেশনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। প্রতিটি সভাতেই কেন্দ্রীয় নীতির কারণে সৃষ্ট ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতিতে বেতন কমিশন ও মহার্ঘভাতার মত জরুরী দাবিগুলি নিয়ে রাজ্য সরকারের টালবাহানার মনোভাবকে ধিক্কার জানানো হয় এবং আগামী ৮, ৯ জানুয়ারি '১৯-এ অনুষ্ঠিতব্য সর্বভারতীয় ধর্মঘটে এই দুটি জরুরী দাবিকে সামনে রেখে এবং কেন্দ্রীয় ১২ দফা দাবিকে সমর্থন জানিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। দীপাবলী উৎসবের অব্যবহিত পরেই এই আহ্বান নিয়ে সমস্ত সংগঠন ও সমস্ত অংশের কর্মচারীদের কাছে পৌঁছবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। □

আগামী ধর্মঘটে রাজ্য কর্মচারীদের দাবিসনদ

রাজ্যের কর্মচারীদের পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনা (বকেয়া মহার্ঘভাতা ও ষষ্ঠ বেতন কমিশন) ও ধর্মঘটের অধিকারসহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষা এবং নিম্নলিখিত ১২ দফা সর্বভারতীয় দাবির সমর্থনে ৮, ৯ জানুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য প্রশাসনে নিশ্ছিদ্র ধর্মঘট— ১। মূল্যবৃদ্ধি রোধ, সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রীর আগাম বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা। ২। সম্মানজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। ৩। সমস্ত শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি মাসে ১৮ হাজার টাকার কম হওয়া চলবে না। ৪। শ্রমিক বিরোধী শ্রম আইন সংশোধন বন্ধ কর। ৫। স্বামীনাথক কমিশনের সুপারিশ মতো কৃষকদের ফসলের লাভজনক দাম প্রদান, ফসলের সরকারী সংগ্রহ সুনিশ্চিত করা। ৬। গরীব চাষি ও ক্ষেতমজুরদের ঋণ মকুব। ৭। ক্ষেতমজুরদের জন্য সুসংহত আইন প্রণয়ন। ৮। সমস্ত গ্রামীণ অঞ্চলে এম জি এন রেগার রূপায়ণ। শহরাঞ্চলকে এর আওতায় আনতে আইনের সংশোধন। ৯। সর্বজনীন খাদ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আবাসনের ব্যবস্থা। ১০। সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা, চুক্তিপ্রথা বর্জন, সমকাজে মহিলা-পুরুষের সমান মজুরি। ১১। পুনঃবন্টনযোগ্য ভূমিসংস্কার। ১২। বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণ বন্ধ।

ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশনে ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির

আগামী ৮ ও ৯ জানুয়ারি'১৯ দেশব্যাপী ধর্মঘটকে সফল করতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্পভিত্তিক ফেডারেশনগুলির রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৯ অক্টোবর '১৮, কলকাতার মৌলালী যুবকেন্দ্রে। এই কনভেনশন থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে, ধর্মঘটের দাবিগুলিকে শুধু ব্যাপক প্রচারই নয়, রাস্তায় নেমে ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ২৮ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীর মবলঙ্কর হলে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আহ্বানে আয়োজিত জাতীয় কনভেনশন থেকে এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত হয়। একই সাথে অন্যতম সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রতিটি রাজ্যেও অনুরূপভাবে রাজ্য কনভেনশনে সংগঠিত করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী এদিনের এই কনভেনশন।

ট্রেড ইউনিয়ন কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন বিজয় শংকর সিংহ

এদিনের কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু। তিনি বলেন, মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের বর্শামুখ হলেও এ রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণীকে আক্রান্ত হতে হচ্ছে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের হাতে। সাধারণ ধর্মঘটের প্রচারে যুক্ত করতে হবে সাধারণ মানুষকেও। কারণ ধর্মঘটে শুধু শ্রমিকদের নয় সাধারণ মানুষের রুটি-রুজির জ্বলন্ত দাবিও রয়েছে। দুদিনের ধর্মঘটকে আরো ব্যাপক মাত্রা দিতে প্রয়োজন দাবিগুলি নিয়ে নিরন্তর প্রচার। প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন আইএনটিইউসি নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা, সাধারণ মানুষ রাজনীতি

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

শারদ শুভেচ্ছা ও একটি কৈফিয়ৎ

সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক বন্ধুদের উৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা। পাশাপাশি একটি বিষয়ে অবগত করা হচ্ছে যে দীর্ঘ পূজাবকাশের কারণে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যা যৌথভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। নভেম্বর থেকে যথারীতি মাসিক সংখ্যা হিসেবেই প্রকাশিত হবে।

পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী

মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সংগঠনের পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/৮০/১৮ তারিখ ঃ ২৯/১০/২০১৮

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
নবান্ন, হাওড়া

মহাশয়া,

আপনার নিকট একাধিকবার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জরুরী দীর্ঘদিনের বকেয়া আর্থিক ও অধিকারগত দাবি নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্মচারী সমাজ ও তাদের পরিবারের স্বার্থ রক্ষায় পত্র দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বকেয়া ৫৬ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন আড়াই বছর বৃদ্ধি করে তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২৬ নভেম্বর, ২০১৮ মধ্যে সুপারিশ গ্রহণ ও কার্যকর করা, শূন্যপদ পূরণ, চুক্তিপ্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন, প্রশাসনিক জটিলতায় হেলথ স্কীমে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিলের অর্থ পেতে অযথা বিলম্ব হওয়া সহ গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি পূরণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেয়ার জন্য দ্রুততার সাথে আপনার হস্তক্ষেপ দাবি করছি।

ইতিমধ্যে দেশের সব রাজ্যে মহার্ঘভাতা সহ বেতন কমিশন লাগু হওয়ায় কর্মচারীরা বর্দ্ধিত আর্থিক সুবিধা ভোগ করছে। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে তার তালিকা দিয়েছি। বর্তমানে পেট্রোপণ্যের সর্বোচ্চ রেকর্ড ব্যাপকভাবে দর বৃদ্ধি এবং আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী, শিক্ষক মহাশয়গণ, শিক্ষাকর্মী, বোর্ড কর্পোরেশন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জীবনধারণ যন্ত্রণাক্লিষ্ট ও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবে দেশের অন্যান্য রাজ্যের সাথে ব্যাপক বেতন বৈষম্যজনিত কারণে আপনার কর্মচারী সমাজ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও চরম বঞ্চনার শিকার হচ্ছে।

এমতাবস্থায় কর্মচারী সমাজের অসহনীয় সমস্যা বকেয়া ৫৬ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন অবিলম্বে চালু করাসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ন্যায্য দাবিসমূহ দ্রুত ও সুষ্ঠু সমাধানের জন্য দাবি জানাচ্ছি। আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ এই মুহূর্তে দাবিগুলি নিয়ে আপনার সাথে আলোচনায় বসে আশু জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে সমাধান আশা রাখছি।

আপনার বহুমুখীন ব্যস্ততার মধ্যেও উল্লিখিত কর্মচারী সমাজের কাঙ্খিত ও জরুরী সমস্যাগুলি সমাধানে দ্রুত আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়

(বিজয়শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদকীয়

আসন্ন ধর্মঘটের সম্ভাবনাময় প্রেক্ষিত

আগামী ৮, ৯ জানুয়ারি ২০১৯, দেশজোড়া ৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে প্রায় সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলি। যার মধ্যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংগঠন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনও রয়েছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি প্রসঙ্গে 'প্রায়' শব্দটি ব্যবহার করার কারণই হলো, একটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বি এম এস এই ধর্মঘটে থাকছে না। না থাকার কারণটা খুব পরিষ্কার— কেন্দ্রে সরকার চালাচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। যা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের রাজনৈতিক শাখা। আবার ভারতীয় মজদুর সংঘ হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ পরিচালিত একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। সেই অর্থে এরা ভাই ভাই। ফলে এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে সে তার যতই কু-কীর্তি থাকুক না কেন, ডাকা ধর্মঘটে আর এক ভাই শামিল হবে, এটা নিশ্চয়ই আর এস এস চায় না। তাই বি এম এস সরে দাঁড়িয়েছে। এমন ঘটনা এবারেই যে প্রথম তাও নয়। মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটি তৃতীয় সর্বভারতীয় ধর্মঘট। আগের দুটি ধর্মঘটের (২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ এবং ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬) ক্ষেত্রেও এইভাবেই সরে দাঁড়িয়েছিল বি এম এস। কিন্তু তার জন্য ধর্মঘটের ব্যাপকতা, এমনকি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেও এতটুকু হ্রাস পায়নি। স্বভাবতই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বি এম এস আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ ধর্মঘটগুলির অন্যতম আহ্বায়ক না হলেও, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা এই সংগঠনের অন্তর্গত সংগঠনসমূহ এবং অনুগামী শ্রমিক কর্মচারীরা ব্যাপক সংখ্যায় উপরোক্ত দুটি ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাই বি এম এস ধর্মঘট থেকে সরে দাঁড়ালেও, বিগত দুটি ধর্মঘটে কোনো রাজ্যেই সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করেনি। এমনকি ধর্মঘট বিরোধী কোনো বিবৃতিও দেয়নি। বিরোধিতা না করার কারণটাও স্পষ্ট। যে দাবিগুলিকে সামনে রেখে বিগত দুটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলি ছিল এতটাই প্রাসঙ্গিক যে, বিরোধিতা করলে সংগঠনের পায়ের তলার মাটি সরে যেত। সংগঠনের প্রতি অনুগামীদের আস্থা হ্রাস পেত। এবারের ধর্মঘটেও যে বি এম এস একইরকম নিষ্ক্রিয় সমর্থকের ভূমিকা নেবে, তা বোঝাই যায়। কারণ বিগত দু'বছরে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণ তীব্রতর হয়েছে, পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মানুষের ক্ষোভও। মোদি সরকারের জনপ্রিয়তার গ্রাফ যে নীচের দিকে নামছে, তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে মোদিজীর একান্ত অনুগত কর্পোরেট মিডিয়াও। এই পরিস্থিতিতে ধর্মঘটের বিরোধিতা করা মানে আত্মহত্যার দিকে সংগঠনকে ঠেলে দেওয়া, এটা নিশ্চয়ই বি এম এস-র নেতারা ও তাদের মেন্টর আর এস এস বোঝে।

এবারের ধর্মগটের প্রেক্ষিত, পূর্বোক্ত ধর্মঘট দুটির তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। এবং এর কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণও রয়েছে। প্রথমত, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে যখন ধর্মঘট হয়, সেই সময়ে সারা দেশে মোদি সরকার সম্পর্কে মোহভঙ্গ হয়েছে এমন মানুষের যে সংখ্যা ছিল, আজকে এই সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মোদিজী আদৌ কিছু করতে পারবেন বা করবেন এটা বিশ্বাস করেন এমন মানুষের সংখ্যা এদেশে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। যাদের প্রতিয়িনত মোহভঙ্গ ঘটছে, তারা যে ধর্মঘটে শামিল হবেন তা বলাই বাহুল্য। ফলে এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়, এবারে ধর্মঘটীর সংখ্যা অতীতের সমস্ত সংখ্যাকে ছাপিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, ২০১৫ ও ২০১৬ সালের ধর্মঘট যখন হয়, তখনও নোটবন্দী (নভেম্বর ২০১৬) বা জি এস টি-র ধাক্কা সাধারণ মানুষকে সামলাতে হয়নি। ফলে মোদিজীর 'মন কি বাত' তখন অনেকের কাছেই মধুর মনে হত। কিন্তু জি এস টি এবং বিশেষত 'নোটবন্দী'র ধাক্কায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের যে ক্ষতি হয়েছে, তার ধাক্কা যে এবারের ধর্মঘটে কেন্দ্রীয় সরকার অনুভব করবে তা বলা বাহুল্য। তৃতীয়ত, নয়া উদারবাদী অর্থনীতির অন্যতম কুফল হল ধনী ও দরিদ্রের ক্রমান্বয়ে বৈষম্য বৃদ্ধি। সারা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও এই বৈষম্য এখন কুশ্রী চেহারা নিচ্ছে। অবস্থাটা এখন এতটাই খারাপ যে, নয়া উদারবাদের পক্ষে সওয়ালকারী পুঁজিবাদী অর্থনীতির তাত্ত্বিকরাও এখন ঢোঁক গিলে বিকল্প ভাবনার কথা বলছেন। কেউ কেউ তো এমনও বলছেন যে কার্লমার্কস দেড়শ বছর আগে যা বলেছিলেন, তা আজ সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। 'ইতিহাসের অবসান'-এর তত্ত্ব হাজির করে যিনি আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির নয়নের মনি হয়ে উঠেছিলেন, সেই ফ্রান্সিস ফুকুয়ামাতো সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে মার্কসকে স্মরণ করেছেন এবং এমনকি সমাজতন্ত্র ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এমন কথাও বলে ফেলেছেন। আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিকদের এই দোলাচলের প্রভাব পড়ছে এদেশের পুঁজিবাদের পক্ষে সওয়ালকারী বুদ্ধিজীবী ও অর্থনীতিবিদদের ওপরেও। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যাঁরা মোদিজীর জয়ধ্বনি করে, ঢাক পেটানোটাই একমাত্র কাজ বলে মনে করতেন, আজ তাঁরাও বাধ্য হচ্ছেন ভিন্নসুরে কথা বলতে। 'মোদিজী যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণ করতে পারেননি', 'কর্মসংস্থানের বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে', 'নোটবন্দীর ধাক্কা (যদিও ঐ সময় এঁরা দারুণ সাহসী পদক্ষেপ বলে জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন) দেশের অর্থনীতি এখনও সামলে উঠতে পারেনি', ইত্যাদি ইত্যাদি মন্তব্য এখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে। যদিও কর্পোরেট পুঁজির প্রসাদধন্য এই কলমচীরা এখনও ফুকুয়ামাদের মতন সাহস দেখাতে পারেননি। কর্পোরেট প্রভুদের তুষ্ট করতে এখনও তাঁরা নিয়মিত বামপন্থার বিরুদ্ধে, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে বিষেদ্গার করে চলেছেন। কিন্তু নয়া উদারবাদই একমাত্র পথ বা মোদিজীই মসিহা, দু-তিন বছর আগেও বলা এই কথাগুলো বলার সাহস এখন আর তাঁদের নেই। ফলত, নয়া উদারবাদের পক্ষে, বছর কয়েক আগেও, যে নিশ্ছিদ্র এবং প্রবল প্রচার চলত, তা এখন অনেকটাই দুর্বল। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিতর্কে দীর্ণ। সাধারণ মানুষের সহমত ম্যানুফ্যাকচার করার সুবিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন এই চতুর্থ স্তম্ভটির বর্তমান দুর্বলতা ধর্মঘটের পক্ষে ইতিবাচক উপাদান হিসেবেই কাজ করবে।

চতুর্থত, ব্যাঙ্ক ঋণখেলাপিদের কীর্তিকলাপও এই সময় প্রকাশ্যে চলে এসেছে। বিজয় মালিয়া, নীরব মোদী, মেহুল চোকসি প্রমুখ অপরাধীদের আড়াল করার জন্য মোদী সরকারের তৎপরতা আজ দিনের আলোর মতই সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট। ২০১৫ ও ২০১৬-র সর্বভারতীয় ধর্মঘটের সময় কিন্তু এই ছবিটা এতটা স্পষ্ট ছিল না। সাধারণ মানুষের টাকা নিয়ে যারা নয়ছয় করছে তাদেরকে মোদী সরকার আড়াল করার চেষ্টা করছে — এই বার্তা এখন ভালোভাবেই পৌঁছে গেছে সাধারণ মানুষের কাছে।

পঞ্চমত, মোদি জমানায় পূর্বোক্ত দুটি ধর্মঘটের সময় দুর্নীতি প্রসঙ্গে মোদী সরকারের এমন ল্যাজেগোবরে অবস্থা ছিল না। সেই সময়ও নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর পারিষদরা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন মানুষকে উপহার দেবেন, এমন কথা জোর গলায় বলতেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে এবং সরকার গঠনের পরেও, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর একটি অতিপরিচিত ডায়ালগ ছিল, ''না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা''। আমাদের দেশে বেশ কিছু মানুষ হয়তো এটা বিশ্বাসও করতেন। কিন্তু রাফালে যুদ্ধ বিমান দুর্নীতি প্রকাশ্যে চলে আসার পর এখন মোদীজি মুখে কুলুপ এঁটেছেন। ফলে যাঁরা এযাবৎকাল মনে করছিলেন বা কিছুটা হলেও বিশ্বাস করছিলেন যে, মোদীজি দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন উপহার দিতে পারেন তাদের সেই বিশ্বাস ভেঙ্গেছে। পাল্লাদিয়ে বেড়েছে তাদের মোদী সরকার বিরোধী ক্ষোভ। যা আসন্ন ধর্মঘটের পক্ষে একটি ইতিবাচক উপাদান হিসেবে সংযোজিত হবে।

ষষ্ঠত, উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় জনতা পার্টি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠনের পর, শুরু থেকেই ইতিহাস, বিজ্ঞান ও গবেষণার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সে'স প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল তাদের লক্ষ্য। মোদী সরকারের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। পূর্বের দুটি ধর্মঘটের সময় এই বিষয়গুলি চর্চার মধ্যে ছিল। কিন্তু যা উল্লেখযোগ্য, তা হল, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সরকার তাদের তাঁবে আনতে চাইছে এই প্রচার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে খুব বেশি আলোড়িত করেনি। প্রতিবাদের গণ্ডীটা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে মোদী সরকারের পক্ষ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আর বি আই), সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সি বি আই), এবং এমনকি বিচার ব্যবস্থার কাজেও হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এমন অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ-এর মতো প্রতিষ্ঠানে সরকার দখলদারি কায়েম করতে চাইছে, এ বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে যত না আলোড়ন তৈরি করে, তার থেকে অনেক বেশী আলোড়ন তৈরি হয় বিচার ব্যবস্থা, আর বি আই বা সি বি আই-এর ক্ষেত্রে। কারণ এই সংস্থাগুলি সম্পর্কে এবং তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সব মানুষের মধ্যেই কমবেশি ধারনা রয়েছে। সরকার কোনো কারণে প্রতিহিংসা পরায়ণ হলে সি বি আই বা আইন-আদালত সাধারণ মানুষকে রক্ষা করে এমন একটা ভরসার জায়গা এখনও রয়েছে। পাশাপাশি আর বি আইয়ের পরিচালনায় সরকারী ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থকে সুরক্ষিত রাখে এই ধারনাও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষের রয়েছে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সরকারের সংঘাত মানুষের মনে বিপদ ঘণ্টা বাজায়। যা বাজতে শুরু করেছে এবং এটিও এবারের আসন্ন ধর্মঘটের একটি অতিরিক্ত উপাদান।

সপ্তমত এবং যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হল শ্রমিক কর্মচারীরা যখন ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেই সময়েই দেশ জুড়ে কৃষক বন্ধুরাও উপর্যুপরি আন্দোলনের ঢেউ তুলছে। ফসলের ন্যায্য দাম, কৃষি ঋণ মকুব, প্রভৃতি জরুরী ও ন্যায্য দাবিগুলি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সংবাদ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের লং মার্চ বা গত ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লীর বুকে শ্রমিক-কৃষক সংঘর্ষ জাঠা প্রভৃতি জঙ্গি আন্দোলনের এই রূপ সাম্প্রতিককালে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের শিক্ষা হল এটাই, শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক সার্বিক ঐক্য যখন তৈরি হয় তখন তা বিস্ফোরক শক্তি ধারণ করে। এবারের ধর্মঘটে সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এই শ্রমিক -কৃষক ঐক্যের রসায়ন।

অষ্টমত, এবারের ধর্মঘটের অব্যবহিত পূর্বে অনুষ্ঠিত হবে ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। যার অনেকগুলিতেই ক্ষমতায় রয়েছে কেন্দ্রীয় শাসক দল বি জে পি। উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্যই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে বি জে পি'র ভালো ফলের আশা খুব কম। দক্ষিণপন্থী উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বি জে পি'র বিরুদ্ধে বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তিগুলিও কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে। যা নিশ্চিতভাবে বি জে পি তথা আর এস এস-এর শিরঃপীড়ার কারণ। এই নির্বাচনগুলিতে প্রত্যাশামত বিজেপি যদি ভালো ফল করতে না পারে, তাহলে আসন্ন ধর্মঘটে অংশগ্রহণে তা মেহনতী মানুষকে উদ্দীপিত করবে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য হল, ৮-৯ জানুয়ারির সর্বভারতীয় ধর্মঘটের কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। স্বভাবতই ধর্মঘটকে সামনে রেখে ধর্মঘটী সংগঠনগুলি যখন প্রচার চালাবে, তার সমান্তরালে বিভিন্ন বি জে পি বিরোধী রাজনৈতিক দল (যারা প্রকৃত অর্থে বিরোধী) আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারের কাজ শুরু করে দেবে। এই দুই ধারার সম্মিলিত প্রচার সাধারণ মানুষকে ধর্মঘটের পক্ষে টেনে আনার অনেক বেশি শক্তি ধারন করবে।

এ পর্যন্ত যে কারণগুলি বলা হল সেগুলি সবই ধর্মঘটের পক্ষে ইতিবাচক শক্তি বা ফোর্স হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু এর বিপরীত একটি বিষয় বা কাউন্টার ফোর্সও পরিকল্পিতভাবে আর এস এস, বি জে পি তথা সংঘ পরিবার তৈরি করার চেষ্টা করছে। যা হল পুনরায় রামমন্দির তৈরি করার জিগির। ইতিমধ্যেই হিন্দুবাদীবাদী সংগঠনগুলির নেতারা এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক তথাকথিত সাধুসন্তরা অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তুপ স্থলেই রামমন্দির নির্মাণ করার হুঙ্কার ছেড়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অযোধ্যায় বিতর্কিত জমিটি চরিত্র নির্ধারণের জন্য একটি মামলা সর্বোচ্চ আদালতের বিচারাধীন রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়টিকে অগ্রাধিকারভুক্ত মামলা হিসাবে বিবেচনা করেনি। কিন্তু হিন্দুত্ববাদীরা এটিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে প্রচারে নামতে চাইছে। কারণ তারা জানে, মোদি সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে বিপথে চালিত করতে হলে, রামমন্দির ইস্যুকে ব্যবহার করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই।

স্বভাবতই আসন্ন ধর্মঘটের প্রস্তুতি পর্বে যেমন অনেকগুলি ইতিবাচক উপাদান ক্রিয়াশীল থাকবে, তেমনই ধর্মীয় জিগির সমন্বিত নেতিবাচক উপাদানটিও ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হবে। শ্রমজীবী মানুষকে ধর্মঘটকে সফল করার উদ্যোগের পাশাপাশি নিজেদের ঐক্যকে রক্ষা করার প্রতিও যত্নশীল হতে হবে। তাহলেই ধর্মঘটের সাফল্য হবে প্রশ্নাতীত। এই সামগ্রিক ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়গুলি আমাদের রাজ্যেও ক্রিয়াশীল। এর সাথে যুক্ত রয়েছে অতিরিক্ত কিছু উপাদান। যা পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। □

৫ নভেম্বর, ২০১৮

শোক সংবাদ

অভিজিৎ চক্রবর্তী

রাইটার্স বিল্ডিংস গ্রুপ-ডি কর্মচারী সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, মহাকরণ অঞ্চলের দপ্তর সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ চক্রবর্তী গত ১১ অক্টোবর, ২০১৮ অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৭ বছর। কমরেড অভিজিৎ চক্রবর্তী কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারা অধিকারে ১৯৯৫ সালে গ্রুপ-ডি পদে যোগদান করেন। চাকরী পাওয়ার পরেই রাইটার্স বিল্ডিংস গ্রুপ ডি কর্মচারী সমিতির সদস্য হন এবং ঐ অধিকারের কর্মচারী আন্দোলনের তদানিন্তন নেতৃত্ব অমিয় চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন সরকার এবং বর্তমান সংগঠক-কর্মীদের সংস্পর্শে এসে অচিরেই নিজেকে সংগঠনের একজন কর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইউনিট কমিটির নেতৃত্ব থেকে সংগঠনের নেতৃত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার মূল উপাদান ছিল কর্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করা এবং সংগঠনের প্রতি অকৃত্রিম আস্থা ও ভালোবাসা। সকলের সঙ্গে তিনি খুব সহজেই মিশতে পারতেন। সংগঠনের কাজে প্রচুর পরিশ্রম করতেন। কোন কাজে তার বিরক্তি ও নেতিবাচক মনোভাব ছিল না। ২০১০ সালে তিনি রাইটার্স বিল্ডিংস গ্রুপ-ডি সমিতির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং ২০১২ সালে সমিতির দপ্তর সম্পাদক এবং বিগত সম্মেলন থেকে তিনি সমিতির সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি শুধুমাত্র সমিতির নেতৃত্ব ছিলেন না। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহাকরণ অঞ্চলেরও তিনি ছিলন সংগঠক, নেতা। মহাকরণ অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির ২০১৬ সালের সম্মেলন থেকে তিনি অঞ্চল সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হন। সংগঠনের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা নিয়ে তিনি সমিতি ও অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগপৎ দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে আমৃত্যু পালন করে গিয়েছেন। একথা নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা দরকার, ২০১১ সালে রাজ্যে প্রশাসনিক পট পরিবর্তনের পর যে জটিল, কঠিন এবং আক্রমণাত্মক পরিস্থিতি বিরাজমান, সেই পটভূমিতেও তিনি ছিলেন সংগঠনের অন্যতম একজন সাহসী, সংগ্রামী সৈনিক। সাহসিকতার সঙ্গে লড়াকু মানসিকতা নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন। এই সময়কালে সংগঠনের আহ্বানে প্রতিটি ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন, তার প্রচার করেছেন নির্ভীকভাবে। অন্যদিকে প্রশাসনিক 'জেলখানা' নবান্নে গিয়ে সদস্য সংগ্রহ করেছেন। আবার কর্মচারী ভবন থেকে সংগ্রামী হাতিয়ার নিয়ে গিয়ে বিতরণের দায়িত্ব পালন করেছেন। এক সংগ্রামী, দৃঢ়চেতা, সৎ মানুষ ছিলেন অভিজিৎ চক্রবর্তী।

অভিজিৎ চক্রবর্তী শুধুমাত্র সংগঠনের প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন না, প্রশাসনের তিনি ছিলেন একজন দায়িত্ববান কর্মচারী। তার প্রতি অর্পিত প্রশাসনিক দায়িত্বের বাইরে গিয়ে কর্মচারী স্বার্থের বিভিন্ন কাজ করতেন হাসিমুখে। অফিসে কর্মচারীদের কাছে ছিলেন এক সদা হাস্যময় অকৃত্রিম বন্ধু। তার কাজের প্রতি নিষ্ঠার জন্য আধিকারিকরাও তাকে খুবই স্নেহ করতেন। কারা অধিকারের সর্বোচ্চ আধিকারিক তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের জন্য শ্মশানে পুষ্পস্তবক প্রেরণ করেছিলেন, বর্তমান সময়ে যা বিরল ঘটনা।

সমাজের প্রতিও তিনি ছিলেন দায়বদ্ধ এক মানুষ। এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কাজে তিনি যুক্ত থাকতেন। এলাকাতেও তিনি ছিলেন জনপ্রিয়।

অভিজিৎ চক্রবর্তী ছিলেন শোষিত মানুষের পক্ষের একজন সংগ্রামী মানুষ। তিনি আমৃত্যু ছিলেন বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ।

বিগত ১ নভেম্বর ২০১৮ ছুটির পর কর্মচারী ভবনে অভিজিৎ চক্রবর্তীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তাঁর পরিবারের পক্ষে স্মৃতিচারণা করেন তাঁর একমাত্র পুত্র। □

নন্দিনী গুহ

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন পুরুলিয়া জেলার প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির প্রাক্তন জেলা সভাপতি নন্দিনী গুহ গত ৩০.১০.২০১৮ নিজ বাসভবনে প্রয়াত হয়েছেন। নন্দিনী গুহর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক প্রচেতা কুমার দাস, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পুরুলিয়া জেলা শাখার সম্পাদক লালমোহন গ্রহাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির জেলা সম্পাদক পার্থ বিজয়া মাহাতো, ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন পুরুলিয়া জেলা সম্পাদিকা অনিমা দেওঘরিয়া, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাধনা ঘোষ সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন তাঁর পুত্র নিলয় গুহ ও কন্যা বন্দিতা গুহ। পরবর্তীকালে দেহদানের জন্য প্রয়াত নন্দিনী গুহর মরদেহ বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। □

দৃষ্টি আকর্ষণ

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আসন্ন ধর্মঘটের প্রস্তুতিপর্বে আগামী ১১ এবং ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ প্রতিটি জেলায় অনুষ্ঠিত হবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কর্মীসভা।

বিবেকানন্দর শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর

[১৮৯৩ সালে শিকাগোয় আয়োজিত বিশ্ব ধর্ম সংসদে স্বামী বিবেকানন্দর সাড়া ফেলা বক্তৃতার মূল সাফল্য নিহিত ছিল তৎকালীন ঐতিহাসিক বাস্তবতার সীমাবদ্ধতা এবং ধর্মতত্ত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করার সক্ষমতার মধ্যেই।]

আমি যখন 'ফ্রন্টলাইন' পত্রিকার জন্য এই লেখাটা লিখতে শুরু করছি, তখন ১২৫ বছর আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার সংবাদ আমাকে নাড়া দিচ্ছে। সেই সময় শিকাগোয় এক অখ্যাত ভারতীয় বিবেকানন্দর বক্তৃতা ভারতে এক সাড়া জাগানো সংবাদ হয়ে উঠেছিল। এই বিষয়টি নিয়ে পুনরালোচনা জরুরী হয়ে উঠেছে, কারণ যে বার্তা বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আমাদের দিতে চেয়েছিলেন, তা সম্ভবত হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁর বক্তৃতার প্রকৃত নির্যাস তুলে ধরার যে কৃতিত্ব তাঁর কয়েকজন অনুগামী দাবি করেন, তা-ই বা কতটা সঠিক? বিবেকানন্দর বক্তৃতার বিষয়বস্তু আজকের দিনে পুনরায় পাঠ করলে বোঝা যায়, আমরা এর সম্পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করতে আজও অক্ষম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কিভাবে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে খ্রীস্টীয়বাদের প্রসার ঘটেছে। অন্যান্য ধর্মকে হীন করে দেখানোর খ্রীস্টীয় মিশনারিদের যে প্রচেষ্টা, তার জবাব দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসভার দশম দিনে। ''ধর্ম ভারতের জরুরী প্রয়োজন নয়'' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, ''আপনারা খ্রীস্টীয় ধর্মাবলম্বী যাঁরা, তাঁরা গোটা পৃথিবীর যাঁরা অখ্রিস্টান তাঁদের আত্মার শুদ্ধিকরণের জন্য মিশনারিদের পাঠান, তাহলে কেন আপনারা তাঁদের দেহগুলিকে ক্ষুধার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন না? ... তাঁরা রুটি চাইলে, আমরা তাঁদের পাথর দিই। ক্ষুধায় কাতর মানুষের কাছে ধর্মোপদেশ দেওয়া মানে তাঁদের অপমান করা। ক্ষুধায় কাতর মানুষকে ধর্মতত্ত্ব শেখানো মানে তাঁদের অপমান করা। (বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, কলকাতা, ১৯৬৩; প্রথম খণ্ড, পৃ-২০)।

ঠিক ১২৫ বছর আগে, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, বিবেকানন্দ শিকাগোর ধর্ম সংসদে 'হিন্দুত্ববাদ'-এর ওপর বক্তব্য রেখেছিলেন। এমন এক বক্তব্য, যা পরবর্তী পর্বে গোটা বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল। এবং তার পরবর্তী বহু দশক ধরে ঐ ব্যক্তিকে ঘিরে চর্চা চলেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত, আমরা কি সত্যিই তৎকালীন বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পেরেছি, বা বিশ্বমঞ্চে ভারতের অন্যতম এক প্রতিনিধির 'হিন্দুত্ববাদ'কে পুনর্গঠনের তাৎপর্যটাকে ধরতে পেরেছি? ইতিহাসের সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপটে ঠিক ঐ সময়টির তাৎপর্য কি? এটির গুরত্ব শুধুমাত্র ঐ ধর্মসংসদের কার্যবিধি পাঠ করলে বোঝা যায় না। গুরুত্বটা তখনই উপলব্ধি করা সম্ভব, যখন আমরা ঐ সময়কার প্রেক্ষিত ও ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণটিকে বিচার করি। তখনই বোঝা যায় কেন বিবেকানন্দর বক্তৃতা এমন সাড়া ফেলে দিয়েছিল?

উত্তরটা খুব সহজে খুঁজে পাওয়ার নয়। কারণ বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যাকে পাশ্চাত্য দুনিয়া দেখার সুযোগ পেল, তা কিন্তু নয়। কারণ স্মরণ করা যেতে পারে যে তাঁর আগেই রাজা রামমোহন রায়ের লেখা ও কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতার সাথে পশ্চিমী দুনিয়া পরিচিত ছিল। এমনকি শিকাগোর ঐ ধর্মসংসদেই বিবেকানন্দর সাথে রেভারেন্ড ধর্মপাল বা পি সি মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম বক্তা, তাই সফল হয়েছিলেন, তা কিন্তু নয়। দ্বিতীয়ত বিবেকানন্দ যখন শিকাগো যান, তার আগেই হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পশ্চিমীদের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে।

এর প্রায় একশ বছর আগেই ইউরোপের প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদেরা, বিশেষত ইংরেজ ও জার্মানরা বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করে ফেলেছে, যাতে পশ্চিমের মানুষ ঐ গ্রন্থগুলি পাঠ করতে পারেন। বিবেকানন্দ হয়ত ঐ গ্রন্থগুলিকে তাঁর নিজের মত করে ভাষান্তরিত করেছিলেন, কিন্তু তার বহু আগেই অনেকগুলির ভাষান্তর হয়ে গেছে। তাই অভিনবত্বের জন্যই বিবেকানন্দর বক্তৃতা সাড়া ফেলেছিল, তাও নয়। তৃতীয় সম্ভাব্য কারণ (বিবেকান্দর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছাড়া) বলে মনে হতে পরে, বিস্তৃত পরিসরে ধর্ম ও আদর্শগত প্রচারের সূচনা হয়েছিল তাঁর শিকাগো বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। এটা ঠিকই যে তাঁর বক্তব্য ধর্ম ও আদর্শগত প্রচারের সঠিক দিশা দেখিয়েছিল। কিন্তু এই মূল্যায়ণ আমরা করতে পারছি আজ, ইতিহাসনিষ্ঠ বোধোদয়কে ভিত্তি করে। ১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দর সমসাময়িক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের পক্ষে এই মূল্যায়ণ করা সম্ভব ছিল না, কারণ ধর্ম ও আদর্শগত প্রচারের বিস্তৃতি তখনও অজানা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। তাই এই কারণটিও শিকাগো বক্তৃতার তৎকালীন জনপ্রিয়তার প্রকৃত কারণ নয়।

স্বভাবতই উপরোক্ত কোন কারণই শিকাগো বক্তৃতা তৎকালীন সময়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সম্ভবত, প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে, আমাদের শিকাগো বক্তৃতার সমকালিন ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটিকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। আসুন আমরা ১৮৫৭ থেকে ১৮৯৩-র মধ্যে এদেশে ও বিদেশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে একটু বিবেচনা করি। ভাবুন, ১৮৯৩-র ঠিক আগের পাঁচ বছর কি ঘটেছিল। ১৮৮৮ সালে ফ্রান্স তার সাম্রাজ্যবাদী থাবা কম্বোডিয়া সহ সমগ্র ইন্দো-চিনে প্রসারিত করে। ১৮৮৯ সালে ইতালি ইথিয়োপিয়া বা আবিসিনিয়া দখল করে, এবং সিসিল রোডস্ ব্রিটেনের সহায়তায় দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তরীপে উপনিবেশ প্রসারিত করতে সচেষ্ট হন। ১৮৯০ সালে ব্রিটেন উগান্ডা ও নাইজেরিয়ায় দখলদারি কায়েম করে এবং তার পরের বছর বরনিয়োকে কয়েকটুকরো করে হল্যান্ডের সাথে ভাগ করে নেয়। ১৮৯২ সালে ব্রিটেন ইজিপ্টের রাজার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ফরাসিরা পশ্চিম আফ্রিকার দাহোমি রাজ্যের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে। ১৮৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাওয়াই দ্বীপকে তাদের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ফরাসিরা সিয়ামে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে। ঐ একই সময়ে ব্রিটিশরা দক্ষিণ আফ্রিকায় মেটাবেলি বিদ্রোহ এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতিদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করে। এই কয়েকটি হল, শিকাগো বক্তৃতার সমকালিন সময়ে সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগমনের কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। বস্তুতপক্ষে ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মসংসদ ছিল ক্রিস্টোফার কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার (১৪৯৩) এবং আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপের প্রবেশের পথ খুলে যাওয়ার ৪০০ বছর পুর্তি উদযাপনের অংশ।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, বিবেকানন্দ তাঁর ১৯ সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায় সারা বিশ্বে পাশ্চাত্য আধিপত্যের বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''আমরা যারা প্রাচ্য থেকে এখানে দিনের পর দিন বসে রয়েছি, আমাদের প্রতি অনুকম্পা দেখিয়ে বলা হয়েছে যে আমাদের খ্রীস্টত্ব গ্রহণ করা উচিত কারণ খ্রীস্টান দেশগুলিই সর্বাধিক সমৃদ্ধ।

আমরা যখন নিজেদের দিকে তাকাই, তখন দেখি পৃথিবীর সব থেকে সমৃদ্ধ দেশ ইংল্যান্ডকে। যে ইংল্যান্ড ২৫ কোটি এশিয়বাসীর গলার ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরে তাকালে আমরা দেখি, খ্রীস্টীয় ইউরোপের সমৃদ্ধি শুরু হয়েছিল স্পেন থেকে। আবার স্পেনের সমৃদ্ধি শুরু হয়েছিল মেক্সিকো দখল করার মধ্য দিয়ে। খ্রীস্টীয় মতবাদ সমৃদ্ধির পথে যাত্রা শুরু করেছে, তারই সদস্যগণের গলা কেটে (দ্য টাইমস্, ডিবিউক ইয়োরা, সেপ্টেম্বর ২৯,১৮৯৩। উল্লিখিত হয়েছে এম এল বুর্ককে লিখিত বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা (১৯৬৬), পৃঃ ৮১-৮২ গ্রন্থে)। এই মন্তব্য থেকেই বিবেকানন্দর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটি বোঝা যায়। বিবেকান্দর শিকাগো ধর্মসম্মেলনের বক্তৃতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তিনি এমন একটা সময়ে, তাঁর বক্তব্য উত্থাপন করেছিলেন যখন, ইউরোপীয় শক্তি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করছে এবং ক্রিস্টোফার কলম্বাসের কীর্তি উদযাপিত হচ্ছে। বিবেকানন্দ শিকাগো সহ বিভিন্ন সময়ে তাঁর বক্তৃতায় বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তর্নিহিত গুণাবলীকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে, ঐ সময়ে পাশ্চাত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ভাবনায় জারিত ছিল না। উল্লিখিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটিকে বিচার করলেই এটা বোঝা সম্ভব।

শিকাগো ধর্ম সংসদের সভায় অন্যান্যদের সাথে স্বামী বিবেকানন্দ

জাতিবাদ

এই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে উত্তর আমেরিকায় জাতিভেদ প্রথা এবং ১৮৯৩ সালে শিকাগো সম্মেলনে খ্রস্টীয় উৎকর্ষতা প্রতিষ্ঠিত করার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। আমেরিকায় জাতিবাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিবেকানন্দর হয়েছিল। তিনি শ্রীমতি বুলকে লিখেছিলেন, কিভাবে তাঁকে গায়ের রঙের জন্য বাল্টিমোরে একটি হোটেল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। (বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৭৯, মিসেস বুলকে লেখা পত্র, ২৭ অক্টোবর, ১৮৯৪)। যদিও উল্লেখ করা উচিত, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি উদরবাদী আমেরিকাবাসীদের সাহায্য পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি মর্মস্পর্শী ঘটনার কথা বলেছেন মেরি লুই ব্রুক। শিকাগো সম্মেলন চলাকালিন বিবেকানন্দ ২৬২, মিশিগান এভিনিউতে জন বি লিয়নের অতিথি হিসেবে ছিলেন। ঐ বাড়ীর কর্ত্রী সন্ধ্যাবেলায় বিবেকান্দকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু ''যখন তিনি ঘুমোতে গেলেন (তাঁর নাতনিই লিখছেন) তাঁকে দেখে চিন্তিত মনে হচ্ছিল। আমাদের কয়েকজন অতিথি ছিলেন দক্ষিণী ... দক্ষিণীরা আবার সাদা চামড়া ব্যতীত অন্যান্যদের পছন্দ করে না। যখন আমার পিতামহ ঘুম থেকে উঠলেন, তখন তিনি তাঁকে সমস্যাটা বলে সিদ্ধান্ত নিতে বললেন, যে স্বামীজী এবং আমাদের দক্ষিণী বন্ধুদের একজায়গায় রাখা সমীচিন হবে কি না।'' সেই সময়, পিতামহ লিয়ন সিদ্ধান্ত নিলেন, বিবেকান্দর মতন প্রতিভাবান ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিকে অতিথি হিসেবে রাখতেই হবে, তাতে অন্যান্য অতিথিরা যাই ভাবুন না কেন (এম এল বুর্ক, পৃ ঃ ১০০-১০১) এইরকম ছোট ঘটনার মধ্য দিয়েই জাতিবাদ ও তার প্রতিস্পর্ধী উদার চেতনার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। ভারতীয় বংশোদ্ভুত আমেরিকানদের প্রতিও সাদা চামড়ার আমেরিকানদের জাতিবিদ্বেষ ছিল প্রবল। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে (যখন শিকাগো সম্মেলন চলছিল), ভারতীয় বংশোদ্ভুতদের বংশ পরম্পরায় বসবাসকারী এলাকাগুলিতে শিরোকী ভারতীয় জমি দখলের জন্য সাদা চামড়ার ঔপনিবেশিক আক্রমণকে আইনী বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। এর পূর্ববর্তী দু'বছরে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিরোকী ও সিয়ক্স সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল এবং ১৮৯০-এর ডিসেম্বরে সিয়ক্সের প্রখ্যাত রাজা সিটিং বুলকে হত্যা করা হয়। এটা সঠিক জানা যায় না যে আমেরিকায় যারা জাতিবাদের শিকার হচ্ছিলেন, তাদের প্রতি বিবেকানন্দ কতটা সহানুভুতিশীল ছিলেন। কিন্তু খ্রীস্টীয় মতাবলম্বীদের ঘিরে তাঁর যে সংশয়, তার কারণ সম্ভবত পশ্চিমী জাতিবাদ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা। এর সূত্র ধরেই আরও একটি ঐতিহাসিক উপাদান আমাদের নজরে আসে যার মুখোমুখি বিবেকানন্দকে হতে হয়েছিল এবং যা তার কীর্তির তালিকাকে দীর্ঘতর করেছিল। তিনি ছিলেন খ্রীস্টীয় বৃত্তের বাইরের একজন প্রতিনিধি। শিকাগো ধর্মসংসদের আয়োজনই করা হয়েছিল, অন্যান্য ধর্মের তুলনায় খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করার জন্য। সেপ্টেম্বর ১৯, যেদিন বিবেকানন্দ বক্তব্য রেখেছিলেন, গোটা পরিবেশটাই ছিল শ্লেষাত্মক বক্তব্যে থমথমে। যেমন কয়েকটি উপমা হল, ''মাদুরাই ও তাঞ্জোরের চর্বিযুক্ত ষাঁড়,'' ''অবাস্তব ধর্মের অনুগামী'' ইত্যাদি এবং এই ধরনের মন্তব্য চলেছিল শেষদিন পর্যন্ত। ১৯ সেপ্টেম্বরের একটি স্থানীয় পত্রিকার শিরোনাম ছিল, ''নিজেদের মধ্যে কটু কথা চালাচালি করলেও, ওরা সকলেই ভাই-ভাই'' (এম এল বুর্ক, পৃঃ ৮০)। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত— পাশ্চাত্য দমন-পীড়নের ফলে দুটি মহাদেশের শোষিত মানুষের ক্ষোভ, পশ্চিমী জাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া, খ্রীস্টীয় মিশনারিদের আক্রমণাত্মক উদ্দীপনার বিরুদ্ধে প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্মগুলির প্রতিরোধ গড়ে তোলার আকাঙ্খা— এই সবকিছুই একটি প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণে বিবেকান্দকে দায়বদ্ধ করেছিল। বিবেকান্দ দক্ষতার সাথে এই দায়িত্ব সামলেছিলেন এবং সে কারণেই প্রাচ্যের মুখপাত্র হিসেবে শিকাগো ধর্ম সংসদে বিপুল আলোড়ণ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য শুধুমাত্র তাঁর ভারতীয় সঙ্গীদেরই মুগ্ধ করেছিল তা যে নয়, তা বোঝা যায় যেভাবে তিনি দেশবাসীদের কাছ থেকে অভিনন্দন বার্তা পাচ্ছিলেন। কলম্বো, মাদ্রাজ, পারমাকুড়ি, মাদুরাই, আলমোরা প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকেই অভিনন্দন বার্তা পাঠানো হয়েছিল।

বিবেকানন্দের কৃতিত্ব হল, ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যদি এভাবে বলা যায়, তার উর্ধ্বে ওঠার সক্ষমতা। ১৯ সেপ্টেম্বরের তার প্রধান বক্তৃতায় ধর্মীয় রেষারেষিজনিত সঙ্কীর্ণতা থেকে বেড়িয়ে এসে কতকগুলি সর্বজনীন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রে ছিল ঐক্য সম্পর্কিত সর্বজনীন ধারণা। তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করেন, হিন্দু ধর্মের সমন্বয়বাদী ধারণাকে ব্যাখ্যা করে। ''বেদান্ত দর্শনের সু-উচ্চ আধ্যাত্মিক ধারণা থেকে শুরু করে বহুমাত্রিক পুরাণ কাহিনী সমন্বিত নিম্নস্তরীয় পৌত্তসিকতাবাদ, বৌদ্ধ ধর্মের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নাস্তিকতা, সব কিছুই হিন্দু ধর্মে জায়গা করে নিয়েছে। তারপরে ব্যাখ্যা করলেন অদ্বৈত (ঐক্য) সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং তাক লাগানো মন্তব্য, ''ঐক্যের অনুসন্ধানই বিজ্ঞান।'' এইভাবেই আধ্যাত্মিক ও বিজ্ঞান সাধনার মধ্যে একটা যোগসূত্র রচনা করলেন।

''অজ্ঞদের ধর্ম'' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করলেন হিন্দু ধর্মে অনুসৃত কিন্তু খ্রীস্টানদের দ্বারা আক্রান্ত এমন অনেকগুলি বিষয়, যা সব ধর্মই একই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য অনুসরণ করে। ''হিন্দুরা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু যদি কখনও সর্বজনীন কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটি হবে এমন এক ধর্ম, যা কোন স্থান-কালের সীমায় আবদ্ধ থাকবে না। ... যা ব্রাহ্মণ্যবাদী, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, মুসলমান কোন ধর্মই হবে না। বরং হবে এদের সকলের সমন্বয়, এবং যা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হবে। ... এটি হবে এমন এক ধর্ম যার কাঠামোয় নিগ্রহ বা অসহিষ্ণুতার কোন স্থান থাকবে না। যে ধর্ম সমস্ত নর-নারীর সমমর্যাদাকে স্বীকৃতি দেবে, এবং যে ধর্মের সামগ্রিক উদ্যোগ ও লক্ষ্যই হবে মানবজাতির প্রকৃত মুক্তির সন্ধান দেওয়া।'' (বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র-১, পৃঃ ১৯)

এই মানবিক সর্বজনীনতাই বিবেকানন্দের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করেছিল। যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা থেকে বিবেকানন্দের শিকাগো সম্মেলনের সাফল্যকে অংশত বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর প্রকৃত সাফল্য হল আধ্যাত্মিকতাবাদ এবং ঐতিহাসিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে একটি বিশেষ পরিমণ্ডলের সদস্যদের ব্যতিক্রমী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা। খুব কম মানুষই ইতিহাসকে অতিক্রম করতে পরেন এবং তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। □

মূল লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে ফ্রন্টলাইন পত্রিকার ৯ নভেম্বর ২০১৮ সংখ্যায়। লেখক সব্যসাচী ভট্টাচার্য। হিন্দু ধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক বিবেকানন্দের এই বক্তব্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়, আজকের ভারতে যখন আর এস এস পন্থী হিন্দুত্ববাদীদের দাপাদাপিতে বিনষ্ট হচ্ছে মানুষের ঐক্য। অনুবাদ করেছেন সুমিত ভট্টাচার্য।

লেমন ব্রাদার্সের পতনের দশকের একটি পর্যবেক্ষণ

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক লেমন ব্রাদার্সের পতনের এক দশক পূর্ণ হলো। ২০০৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এই ব্যাঙ্কটি দেউলিয়া হয়েছে। এই ব্যাঙ্কের পতনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা যার পূর্ণ হল একদশক।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

এই মার্কিনী ব্যাঙ্কটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক। লেমন ব্রাদার্সের দেউলিয়া ঘোষণার সাথে সাথে বৃহদাকার ব্যাঙ্ক-বীমা-পেনশন ফান্ড প্রভৃতি আর্থিক সংস্থাগুলি একের পর এক দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এই তালিকায় ছিল ফ্রেডি ম্যাক, ফেনি মে, রয়াল স্কটল্যান্ড ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব সুইজারল্যান্ড, বিশ্বের বৃহত্তম বীমা কোম্পানী এ আই জি, প্রুডেন্সিয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি। এর পরিণতিতে মার্কিনী শেয়ার বাজারে ধস নামে। মার্কিনী শেয়ার সূচক ডি জে আই এ, জাপানী শেয়ার সূচক নিক্কেই ২২৫, জার্মানী শেয়ার সূচক ডি এ এক্স সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে ব্যাপকভাবে ধস নামে। এসবের পরিণতিতে একদিনে দুই ট্রিলিয়ন ডলার (দু'লক্ষ কোটি ডলার) পেনশন ফান্ড শেয়ার বাজারে ধুলিসাৎ হয়ে যায়। ইউরোপ, আমেরিকার কোটি কোটি মধ্যবিত্ত নিঃস্ব হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। প্রথমদিকে বিশ্বায়নের সমর্থক অর্থনীতিবিদরা সমস্যাটি সাময়িক বলে উড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস নেয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই বোঝা যায় যে সঙ্কটের কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই এবং এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের কোনো সহজ পথ নেই।

২০০৮ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রত্যক্ষ করে নোবেল পুরস্কারজয়ী পর্তুগীজ সাহিত্যিক জোসে সারামাগো মন্তব্য করেছিলেন, 'কার্লমার্কস কখনও এত নির্ভুল ছিলেন না, এখনকার মতন।'' একজন ব্যাঙ্কার ফাইনান্সিয়াল 'টাইমস পত্রিকায়' লিখলেন, ''ধনতন্ত্র এখন খুবই মার্কসীয় চরিত্রের সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।'' পোপ ফ্রান্সিস ঘোষণা করেন মার্কস তাঁর জীবদ্দশাতেও এতটা প্রাসঙ্গিক ছিলেন না।''

বিশ্ব পুঁজিবাদের ২০০৮ সালে শুরু হওয়া সঙ্কটের কারণ সম্পর্কে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সঙ্কট কোন বিচ্ছিন্ন প্রবণতা নয়। এই সঙ্কট ব্যবস্থাজনিত যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক নিয়মের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। আর্থিক সঙ্কটের কারণ বেপরোয়া ঋণ এবং ফাটকাবাজি। যার ফলে সাব-প্রাইম সঙ্কটের হাত ধরে কর্পোরেটের আর্থিক সমস্যা তৈরি হয়। তারপরই ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দায় মোচনে ব্যাপক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় রাষ্ট্র। তার ফলে কর্পোরেটের ঋণ রূপান্তরিত হয় জনগণের ঋণে। এই প্রক্রিয়া থেকে নতুন সঙ্কটের সৃষ্টি হয়।

এটা ঠিক যে বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্কটগ্রস্ত হয়ে পড়ার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। এর পূর্বেও একাধিকবার পুঁজিবাদ সঙ্কটে পড়েছে। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একদিকে যেমন শোষণমুক্ত নয়, তেমনি অন্যদিকে তা সঙ্কটমুক্তও নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই এর সঙ্কটের উৎস নিহিত থাকে। অর্থাৎ পুঁজিবাদ ব্যবস্থার পথ ধরেই এই মহা মন্দার আত্মপ্রকাশ। অতীতে যে সঙ্কটগুলি পরিলক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ১৯২৯-৩৩ সালের মন্দা। কিন্তু সেই সঙ্কটসহ অতীতের সমস্ত সঙ্কট থেকে বর্তমান পর্যায়ের সঙ্কটের তিনটি বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য রয়েছে। এগুলি হল (১) অতীতে সঙ্কট এত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু ২০০৭-০৮ সাল থেকে সৃষ্ঠি সঙ্কট শুধু এক দশক অতিক্রম করেই গেছে তাই নয়, এই সঙ্কটমোচনের কোন আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। (২) দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে বেইল আউট প্যাকেজের পরিবর্তে ব্যয় সঙ্কোচনের নীতি অনুসৃত হচ্ছে, ফলে বিভিন্ন দেশের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীগুলি আক্রান্ত হচ্ছে। (৩) পুঁজিবাদের কেন্দ্রগুলি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের দেশগুলি আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তুলনামূলক পরিধিতে অবস্থিত দেশগুলি কম মাত্রায় সঙ্কটের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বর্তমানে প্রধানত দু'ধরনের পুঁজির অস্তিত্ব রয়েছে। এর একটি হ'ল বহুজাতিক কর্পোরেশনের পুঁজি যাকে বলা হয় ক্যাপিটাল ইন প্রোডাকশন। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির দখলে রয়েছে বিপুল পুঁজি, উন্নত প্রযুক্তি, বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ, উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির শাসকশ্রেণীর উপর প্রভাব, দানবীয় আকারের প্রচার-মাধ্যমগুলির মালিকানা এবং সর্বাধুনিক পেটেন্ট ব্যবস্থার উপর আধিপত্য। অপর অংশটি হ'ল আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি যাকে বলা হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাজ ফিনান্স। এই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং তা রমরমা আকারে ধারণ করেছে প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে। ইউরো ডলার ও পেট্রো ডলারের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীপুঁজি।

এই পুঁজির পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে বিশিষ্ট বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ মেনার্ড কেইনস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'জেনারেল থিওরি'-তে বলেছেন, ''কোন শিল্প সংস্থার ধীর প্রবাহের উপর ফাটকাবাজরা বুদবুদ রূপে বিশেষ কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কিন্তু অবস্থাটা গুরুতর হয় তখনই যখন শিল্প সংস্থাটি ফাটকাবাজির ঘূর্ণাবর্তের বুদবুদ রূপে দেখা দেয়, যখন কোন দেশের পুঁজির বিকাশ সর্বজনীন নৃত্যশালার ক্রিয়াকলাপের বর্জ পদার্থের পরিণাম হয়, তখন কাজটা মন্দ হওয়ারই সম্ভাবনা।''

বর্তমানে কেইনসের এই হুঁশিয়ারি কার্যত অনেকটা সত্যে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি সংস্থাগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন 'ব্যাঙ্ক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট'-এর তথ্য অনুযায়ী ২০০৮ সালের শেষদিকে বিশ্বের সমস্ত উপজাত (ডেরিভেটিভ্স) বাণিজ্য চুক্তির বুনিয়াদি মূল্য দাঁড়িয়েছে ৬৮০ ট্রিলিয়ন ডলার (এক ট্রিলিয়ন = ১০০ কোটি)। ২০০২ সালে এর পরিমাণ ছিল ১০৬ ট্রিলিয়ন ডলার। মাত্র দু'দশক পূর্বে এর পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। ফাটকার বিপুল বৃদ্ধি এই তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়। এই ছায়া অর্থনীতি সমগ্র বিশ্ব উৎপাদনের (৬৫ ট্রিলিয়ন ডলার) ১০ গুণ এবং সারা বিশ্বের প্রকৃত শেয়ার বাণিজ্যের (১০০ ট্রিলিয়ন ডলার) ছয় গুণ বেশি। এই পুঁজির শোষণ ভয়ঙ্কর।

মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে শিল্প পুঁজির উদ্ভবের অধ্যায় শেষে লিখেছেন, ''পুঁজির সমস্ত শরীর চুঁইয়ে আসে মাথা থেকে পায়ে, সমস্ত রন্ধ্র থেকে আসে রক্ত এবং পুঁজ'। এর সমর্থনে তিনি শ্রমিকনেতা টি.এস.ডার্নিং-এর একটি লেখাকে উদ্ধৃত দেন। এখানে বলা হয়েছে, ''... পর্যাপ্ত মুনাফা থাকলে পুঁজি খুব শক্তিশালী, ১০ শতাংশ হলেও সর্বত্র নিযুক্ত হতে চায়, ২০ শতাংশ হলে আরও তৎপর হয়, ৫০ শতাংশ হলে দৃঢ় ঔদ্ধত্য, ১০০ শতাংশ হলে তা মানবতার সমস্ত আইন লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত হয়, ৩০০ শতাংশের জন্য এমন কোন অপরাধ নেই যাতে যে পিছু পা হয়, এমন কোন ঝুঁকি নেই যা সে না নেয়, এমনকি তার মালিককে ফাঁসিতে লটকে দিতে পর্যন্ত পিছু পা হয় না''। আসলে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির মুনাফা, আরো মুনাফা অর্জনের উদগ্র বাসনা থেকেই এই সঙ্কটের জন্ম।

সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজি পরিচালিত বিশ্বায়নের পরিণতিতে আয় ও সম্পদের ব্যাপক বৈষম্য ঘটেছে। এই বৈষম্য একদিকে যেমন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে বিদ্যমান, তেমনই একটি দেশের অভ্যন্তরে ধনী ও দারিদ্রের মধ্যেও রয়েছে। এর প্রভাবে বেকারী, দারিদ্র্য, কর্মচ্যুতি ক্রমবর্ধমান। ফলে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি সত্ত্বেও চাহিদার অভাব ঘটছে। পুঁজিবাদ এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেতে জনগণের মধ্যে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হয়েছে। সাব-প্রাইম লোন হল এর একটি মাধ্যম। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া সঙ্কটের এটি হল অন্যতম প্রধান উৎস।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার এই এক দশকে আমেরিকা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নব্য ফ্যাসিবাদী ও দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির উদ্ভব ঘটেছে। ২০১৪ সালের ইউরোপীয় সংসদের নির্বাচনে এক-চতুর্থাংশ আসনে এই শক্তি জয়ী হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে ট্রাম্পের জয়, ব্রেক্সিট প্রভৃতি এর উদাহরণ। এর প্রধান কারণ হল সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী পুঁজির আক্রমণের বিরুদ্ধে লিবারাল বুর্জোয়া এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা কোন বিকল্প নীতি জনগণের সামনে হাজির করতে পারছে না। বিপ্রতীকে উভয়েই এর সমর্থক হয়ে পড়েছে। ফলে মানুষের দ্বারা তারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে বামপন্থীরা বিকল্প নীতি উত্থাপন করলেও উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তির অভাবে তার পিছনে মানুষের সমাবেশ সেইভাবে ঘটছে না। দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি এই সঙ্কটের জন্য দেশান্তরী শ্রমিক বিরোধী অভিবাসন আইনকে কঠোর করার দাবি জানাচ্ছে। একইসাথে উদ্বাস্তু বিরোধী ও মুসলিম বিরোধী বক্তব্য হাজির করছে। উপযুক্ত বিকল্প না পেয়ে মানুষ এই দক্ষিণপন্থাকেই আঁকড়ে ধরছে। যেখানে বিকল্প বক্তব্য উত্থাপিত হচ্ছে সেখানে তার ইতিবাচক ফল মিলছে। যেমন গ্রেট ব্রিটেনে জেরেমি করবিন, ফ্রান্সে মেঁলেশা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্নি স্যান্ডার্স এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল, উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর এর প্রভাব সেই মাত্রায় পড়েনি। বিশ্বজোড়া এই মন্দার মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম চীন। এই দেশটি তাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপুল সরকারি বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা থেকে অনেকটাই রক্ষা পেয়েছিল।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক-বীমার ন্যায় সংস্থাগুলির বড় অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে অবস্থান করায় সঙ্কটের আঘাত থেকে এগুলিকে রক্ষা করা অনেকটাই সম্ভব হয়েছে। ২০০৭-০৮ বা ২০০৮-০৯ সালে ভারতের প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সঞ্চয়, সম্পদ, অপারেশনাল প্রফিট এবং নীট প্রফিট সবই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরবর্তীকালে তা অব্যাহত থেকেছে। বিগত তিন বছর ধরে অপারেশনাল প্রফিট বৃদ্ধি পেলেও, নীট প্রফিট থাকছে না, তার কারণ অন্য। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্যাঙ্কের খেলাপী ঋণের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর জন্য অপারেশনাল প্রফিটের একটা বড় অংশ খেলাপী ঋণের জন্য আলাদা করে রাখতে হচ্ছে।

এক্ষেত্রে চিত্রটি নিম্নরূপঃ

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ (কোটিতে)

	২০১৩	২০১৪	২০১৫	০৭-০৮	০৮-০৯	০৯-১০
সম্পদ	৬৯,৬১,৯৮৮	৭৯,৬৮,৭৩০	৮৬,৭৮,৭৭০	৩৪,২১,৯২৪	৩৭,৬৬,৭১৬	—
জমা	৫৭,৪৫,৬৯৭	৬৫,৮৯,০২০	৭১,৯৫,৮৪০	—	—	—
অপারেশনাল প্রফিট	১,২১,৮৩৮	১,২৭,৬৫৩	১,৩৮,০৯৭	৭৩,২৫৫	৮৯,৫৮৩	—
নীট প্রফিট	৫০,৫৮৩	৩৭,০১৯	৩৭,৮২০	২৬,৫৯২	৩৪,৩৯৮	৩৯,২৬১

পূর্বোক্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে ২০১৩ থেকে '১৫ সাল নীট প্রফিট ব্যাতীত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অপারেশনাল প্রফিট, সম্পদ এবং জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবণতা এখনও বিদ্যমান। এছাড়া ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৫টি ব্যাঙ্ক, ২০০৯ সালে ১৪০টি ব্যাঙ্ক, ২০১০ সালে ১৫৭টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যায়। এই সময়ে ভারতে একটিও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বন্ধতো হয়ইনি, উপরন্তু সম্পদ জমা ও লাভ উভয় ধরনের মূল্যমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ও ভারতে জাতীয় অর্থনীতিতে নব্য উদারনীতি প্রয়োগের পরিণতিতে জনজীবনে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছে। বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ অর্থনীতির বৃত্ত থেকে ছিটকে পড়েছে। সোসিও ইকনমিক কাস্ট সেনসাস সহ বিভিন্ন সরকারি রিপোর্টের এর উল্লেখ রয়েছে। 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ'-এর বাগাড়ম্বর কার্যত এক্সক্লুসিভ গ্রোথে পরিণত হয়েছে। এর পাশাপাশি আরেকটি প্রসঙ্গেরও উল্লেখ প্রয়োজন। নব্য উদারনীতি প্রয়োগের শুরুর কালে মধ্যবিত্তের মধ্যে একটা উৎসাহ তৈরি হয়েছিল। বেসরকারি চিকিৎসা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সুযোগ গ্রহণে উদগ্রীব হয়েছিল মধ্যবিত্ত। তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় সন্তান-সন্ততিরা চাকরী লাভের মধ্য দিয়ে উন্নত অর্থনৈতিক জীবনের যে স্বপ্ন মধ্যবিত্তদের একাংশ দেখেছিলেন, বিশ্ব আর্থিক মহামন্দার আঘাতে তা এখন ক্রমশঃ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সমাজের প্রান্তিক অংশ ত্রমশঃ অর্থনৈতিক চালচিত্র থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

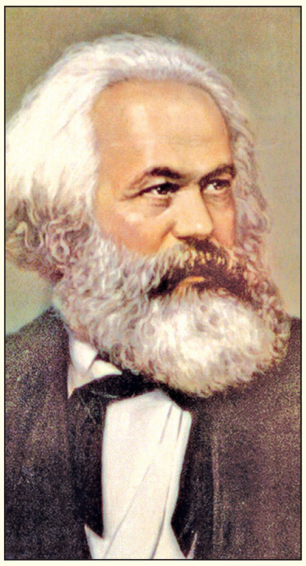

কার্ল মার্কস

ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা চলে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এক কঠিন সঙ্কটের সম্মুখীন। কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর যারা 'ইতিহাসের সমাপ্তি'র নিদান হেঁকেছিলেন, তাঁদেরই এখন বলতে হচ্ছে 'না ইতিহাসকে আরও এগুতে হবে'। এই প্রশ্নে 'এন্ড অব হিস্ট্রি এ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান'-এর লেখক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''সম্পদের পুর্নবন্টনের জন্য সমাজের এই পর্বে আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে যে বিপুল অসাম্য তৈরি হয়েছে তা দুর করতে হলে সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ পুনরায় ফিরে আসতে পারে, বস্তুত তার ফিরে আসা উচিত।'' অথচ, সোভিয়েত পতনের পর স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেছিলেন, মতাদর্শের জন্য মানব সমাজের সন্ধান শেষ হয়ে গেছে এবং পশ্চিমী উদারনৈতিক গণতন্ত্রই সর্বজনীন রূপ নিয়েছে এবং মানবসমাজের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

তবে এটাও সত্য যে উপযুক্ত রাজনৈতিক বিকল্প না থাকায় ধনতন্ত্র এই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তা হবে শোষণ এবং আদিম পুঞ্জীভবনকে আরো তীব্র করে। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মাধ্যমে এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এটা স্মরণে রাখা দরকার যে, পুঁজিবাদের সঙ্কট যত তীব্র হোক না কেন, সেই ব্যবস্থা আপনা-আপনি ভেঙে পড়ে না। মার্কস বিশ্লেষণে করে দেখিয়েছিলেন যে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এবং ধনতন্ত্রের বর্তমান উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে ধনতন্ত্র উৎপাদিক শক্তির একটি অংশকে ধ্বংস করে এবং প্রত্যেক সঙ্কট থেকে আরো শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়ায় শোষণ আরো তীব্র হয়।

এই প্রেক্ষিতে বলা চলে যে ধনতন্ত্রকে উৎখাত করতে হয়, এবং তা নির্ণায়কভাবে নির্ভর করছে সমাজের সেই বস্তুগত শক্তিকে শক্তিশালী করার উপর, যে শক্তির নেতৃত্বে থাকছে শ্রমিকশ্রেণী, যা গণসংগ্রাম সমুহের মাধ্যমে শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভিযান চালাতে সক্ষম। সুতরাং আগামীদিনে শ্রেণী সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা হল বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার এক দশকের পর্যবেক্ষণ লব্ধ অভিজ্ঞতা। □

শতবর্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

অসিত কুমার ভট্টাচার্য
সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

"... উপনিবেশিক এবং আধা উপনিবেশিক দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণ যাঁরা এই গ্রহের নিরঙ্কুশ জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁরা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছেন, বিশেতে রাশিয়া, তুর্কি, পারস্য ও চীন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ... ব্রিটিশ, ভারত এই দেশগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য। এবং সেখানে শ্রমজীবীদের সংখ্যা একদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বর্বর সন্ত্রাসের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ... তারা সর্বকালের তুলনায় ঘন ঘন গণহত্যা (অমৃতসর) সংগঠিত করছে এবং ব্যাপক লাঠিচার্জসহ অন্যান্য দমন পীড়নের আশ্রয় নিচ্ছে।"

—ভি আই লেনিন

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল, বৈশাখীর দিন (পাঞ্জাবীদের উৎসবের দিন)। বিশ শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও শোষণের ইতিহাসে এই গণহত্যা ছিল নৃশংসতম রাজনৈতিক অপরাধ। অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে সমবেত প্রায় বিশ হাজার নিরস্ত্র প্রতিবাদী জনতার উপর জেনারেল আর ই জি ডায়ারের নির্দেশে যে নির্বিচার গুলি চালানো হয় (নিয়োজিত গোর্খা এবং বালুচী ট্রুপের সমস্ত গুলি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত গুলি চলে ১৬০০ রাউন্ড) সরকারী হিসাবে ঘটনাস্থলে মারা যান ৩৭৯ জন মানুষ আর আহত হন ১১৩৭ জন। তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী অন্তত ২০০০ মানুষ নিহত হন আর আহত হন কয়েক হাজার মানুষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্দয় লুণ্ঠন আর নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদী মানুষের উপর এই পৈশাচিক বর্বরতা আর নগ্ন দমন-পীড়ন গোটা জাতির মর্মমূলে নাড়া দিয়েছিল এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নতুন পথে চলার দিশা দেখিয়েছিল। তাই এই লড়াই-এর থেকে শিক্ষা নেয়া এবং সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে দেশের মুক্তির জন্য মানুষের সংকল্পবদ্ধ দৃঢ়তা আর অপরিমেয় সাহস সম্পর্কে বোঝাপড়া গড়ে তোলার জন্য জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে ফিরে দেখা প্রয়োজন। ইতিহাসের শিক্ষা থেকে পুনর্শিক্ষা নিয়ে দুস্তর পথ পেরোতে হবে আমাদের। তাই এই আলোচনা।

পটভূমি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে সারা ভারতে অভূতপূর্ব শ্রমিক ধর্মঘটের তরঙ্গ দেখা দিল।... জনগণের প্রত্যাশা ছিল যুদ্ধের পর জিনিসপত্রের দাম কমবে, কিন্তু তার বদলে দাম বাড়ল। সেই তুলনায় মজুরী বাড়ল না। তাছাড়া যুদ্ধ ভারতের সমাজকে সচেতন করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবি উঠল জোরালোভাবে। সংঘবদ্ধ ধর্মঘট দেখা দিল ১৯১৮ ও ১৯১৯-এ (দি বুলেটিন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যান্ড লেবার, পৃঃ-৪৩) অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুণ বিশ্ব অর্থনীতি নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন হয়। ভারতের পাট, তুলা, তৈলবীজ ও অন্য শিল্পের কাঁচামালের রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায় কৃষকরা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ীদের কাছে কৃষকদের ঋণ দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। কৃষকদের সঙ্গে গ্রামীণ কারিগর ও তাদের পরিবারগুলিও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে দেশজুড়ে কৃষক জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ধূমায়িত হয়। বিহারের চম্পারনে নীলকর সাহেবদের প্রচণ্ড শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন, গুজরাটের কইরা জেলাতে খরা, অনাবৃষ্টিজনিত কারণে ভূমিরাজস্ব দিতে অপরাগ কৃষকদের উপর জমিদার মহাজনসহ ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের প্রতিবাদে কৃষক সমাজ ফুঁসে উঠে। আমেদাবাদে মিল মালিকেরা মিল মজুরদের বেতন না বাড়ানোয় এ ধর্মঘট শুরু করে হিন্দু-মুসলমান সহ সব অংশের মজুর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সারা দেশে এক নতুন নজির সৃষ্টি করল। এর সঙ্গে খিলাফতের দাবিকে যুক্ত করে গান্ধীজির নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল।

১৯১৭ সালে সংঘটিত রুশ বিপ্লবের বিপুল প্রভাব পড়ল ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বসহ প্রতিবাদী শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণের মধ্যে। শোষণ, অত্যাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণই যে শেষ কথা বলে— নভেম্বর বিপ্লব সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিল।

প্রত্যক্ষ কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ এক, পাঞ্জাবকে বেশী 'রক্ত কর' (এখান থেকেই ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যদের প্রধান অংশ নিয়োজিত হত) দিতে হত, দুই, দেশের শস্যভাণ্ডার হিসাবে খ্যাত পাঞ্জাবের কৃষকদের সামরিক খরচের চাপ বহন করতে হত এবং সারা ভারতের মত পাঞ্জাবের কারিগরী ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলি বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তিন, ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পাঞ্জাব সোভিয়েত ও মধ্য এশিয়ার নিকটতম হওয়ায় বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর সংবাদ সেখানে দ্রুত পৌঁছত এবং যুদ্ধ ফেরৎ শিখ সৈন্যরা দেশে ফিরলে সেসব সংবাদ জনগণের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত। চার, পাঞ্জাবে গদর পার্টির প্রভাব তখনও অব্যাহত ছিল এবং এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগকারী প্রবাসী বিপ্লবীদের প্রভাবও সেখানে অটুট ছিল।

এমত পরিস্থিতিতে বৈশাখীর দিন উদযাপনের জন্য (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯) হিন্দু, মুসলিম, শিখ সবাই জড়ো হন এক গ্লাসে জলপান আর এক থালা থেকে খাবার ভাগ করে নেওয়ার উৎসবে। মিলিত ভারতবাসীর এক নতুন মৈত্রী-নতুন ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। যে ঐক্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভয় পায়। সিপাহী-বিদ্রোহের অভিজ্ঞতায় আতঙ্কিত হয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই

কালপর্বে, ১৯১৮ সালে ঠিক হয় পরবর্তী এ আই সি সি অধিবেশনে হবে পাঞ্জাবে। প্রমাদ গোণে শাসক ব্রিটিশ শক্তি। পাঞ্জাবে এই আই সি সি অধিবেশনের দুই সংগঠক, অমৃতসর শহরের দুই জনপ্রিয় নেতা ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলু ও ডাঃ সতপালকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর ফলে ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। হাজার হাজার মানুষ হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে জড়ো হন জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে, ফেটে পড়েন প্রতিবাদে।

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইংরেজরা ভারতবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করে। স্বায়ত্তশাসনের নামে ১৯১৯ সালে 'মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার' আইন পাশ করে। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের মতে এতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের কোনো কথাই ছিল না। কংগ্রেস এই আইনকে তুচ্ছ, বিরক্তিকর ও নৈরাশ্যজনক বলে অভিহিত করে। শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত 'দাসত্বের পরিকল্পনা' বলে চিহ্নিত করেন।

অন্যদিকে ইংরেজরা সমস্ত রকমের রাজনৈতিক ও বিপ্লববাদী কার্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে ১৮ মার্চ পাস করে রাওলাট আইন (Rawlatt Act)। এই দানবীয় আইনে বলা হয় যেকোনো ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে যে কোনো ব্যক্তিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখা বা নির্বাসিত করা, বিনা সাক্ষ্য প্রমাণে বিশেষ আদালতে বিচার করা যাবে এবং বিচারের বিরুদ্ধে কোনো আপীল করা যাবে না। তিনজন বিচারপতিদের একটি প্যানেলের হাতে যে কোনো রাজনৈতিক, বৈপ্লবিক কাজের জন্য যেকোনো ধরনের শাস্তির বিধানের সংস্থান রাখা হয় এই আইনে। এর প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী হরতাল-ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষণা করেন ১৯১৯ সালের ৩০ মার্চ। দিল্লীতে পুলিশ গুলি চালিয়ে ৫ জনকে খুন করে, আহত হন শতাধিক। মার্চ-এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষ জুড়ে এক অভূতপূর্ব জনজাগরণ পরিলক্ষিত হয়। দিকে দিকে হরতাল, ধর্মঘট ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। হিন্দু-মুসলিম-শিখ ঐক্যের ধ্বনিতে ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। যদিও হরতাল পেছিয়ে ৬ এপ্রিল নির্ধারিত হয় কিন্তু কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, আমেদাবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ইংরেজরা অমৃতসরে এ আই সি সি অধিবেশন ভণ্ডুল করতে ১০ এপ্রিল, ১৯১৯ গ্রেপ্তার করে আইনজীবী ডঃ সৈফুদ্দিন কিচলু এবং ডাঃ সতপালকে। এই দুই জনপ্রিয় নেতাকে আটক করে কোনো অজানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনা যেন বারুদে অগ্নিসংযোগ করে। পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে ক্রুদ্ধ জনতা রাস্তায় নেমে পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনতা ভাঙচুর শুরু করে। অমৃতসর জেলা শাসকের দপ্তরের দিকে ধেয়ে যায় দুই নেতার মুক্তির দাবিতে। ব্রিটিশ পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলি চালায়। প্রচুর মানুষ হতাহত হন। পাঞ্জাবের আরো দুই শহর লাহোর-আর গুজরানওয়ালায় হরতাল ও বিক্ষোভ পালিত হয়। ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। শ্রমিকরা বিশেষত রেল শ্রমিকরা এক অসাধারণ ভূমিকা নেয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় পাঞ্জাব কার্যত সামরিক আইনের হাতে চলে যায়।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

পরিস্থিতির উল্লিখিত সামগ্রিক পটভূমিতে দুই নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এক বিপুল নিরস্ত্র জনতা (সংখ্যায় প্রায় ২০,০০০) জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে ১৩ এপ্রিল (১৯১৯) সমবেত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ ছিল একটি ফাঁকা জমি, এর তিনদিক ছিল ঘরবাড়ী বেষ্টিত। প্রবেশ/নির্গমনের জন্য একটিমাত্র রাস্তা ছিল। গর্ভনর ও ডায়ার এবং জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের উপনিবেশিক প্রশাসন রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে নৃশংস প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা করেছিল। সেই উদ্দেশ্যেই ৯ এপ্রিল পাঞ্জাবে নতুন সৈন্য তলব করা হয়েছিল। সমবেত জনতার প্রবেশ নির্গমন পথ রুদ্ধ করে অমৃতসরের সামরিক শাসনকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে জনসাধারণকে সতর্ক না করে রাইফেল আর মেশিনগান থেকে দশ মিনিট ধরে গুলি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ১৬০০ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে। একই সঙ্গে পাঞ্জাবের আরও ৫টি জেলায় সামরিক শাসন জারী করে জঘন্যতম নির্যাতন চালানো হয়। এই ঘটনায় সারা দেশজুড়ে এক বিভীষিকার স্রোত বয়ে যায়। তৈরী হয় এক বিপুল আলোড়ন। এর রেশ গিয়ে পড়ে ব্রিটেনের পার্লামেন্টেও। বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার ঘটনার তদন্তের জন্য হান্টার কমিটি তৈরি করে। কিন্তু এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত করার পরেও পাঞ্জাবের ব্রিটিশ প্রশাসন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভয়ংকর দমন পীড়ন চালায়, "... এর

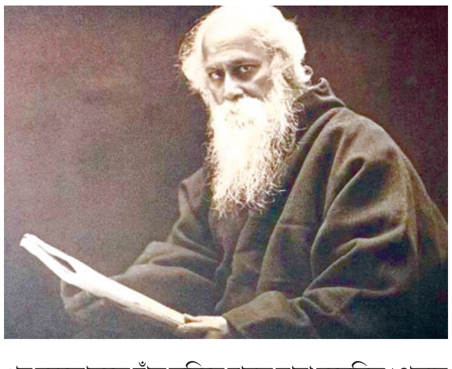

পর বহুলোককে দাঁড় করিয়ে চাবুক মারা হয়েছিল। প্রত্যহ ষোল মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে ছাত্রদের নির্দিষ্টস্থানে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাঁচশতজন শিক্ষক ও ছাত্রকে বন্দী করা হয়েছিল।... একটি বিবাহ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। ... চিঠিপত্র সেন্সর করা হয়েছিল।" জনগণ যাতে সহানুভূতি দেখাতে না পারে সেজন্য লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছিল। হান্টার কমিশনের কাছে জবানবন্দী দিতে গিয়ে বেপরোয়া জেনারেল ডায়ার এই হত্যাকাণ্ডের সপক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন। ১৫ আগস্ট, ১৯১৯ তারিখে তাঁর বিবৃতি ছিল, "I fired and continued to fire till the crowd dispersed and I considered that this is the least amount of firing which would produce the necessary moral and wide-spread effect and it was my duty to produce if I was to justify my action." ব্রিগেডিয়ার পরিষ্কারভাবে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন, "to strike terror into the whole of Punjab." এবং নিঃসংকোচে বলে যান, "I had made up my mind that I would do all men to death if they were going to continue the meeting."— এই হল মদগর্বী পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীদের বক্তব্য।

গণসংগ্রামের এক নতুন পর্ব

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর প্রভৃতি শিল্প কেন্দ্রগুলিতেই ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রা মারাত্মক আকার নেয়। আহমদাবাদের বস্ত্রকল শ্রমিকরা ব্যাপক রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করে। গণ আন্দোলনের নতুন তরঙ্গ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করে। সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে অমৃতসরে এ আই সি সি-র নির্ধারিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই অধিবেশন থেকেই সারা ভারতজুড়ে প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। ভারতীয় জনগণের ঐক্য ও সংহতিবোধ এক নতুন মাত্রা অর্জন করে। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন পাঞ্জাবের ঘটনাবলী ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিলেন এবং প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করে ভারতবর্ষের মানুষের উজ্জীবিত সংগ্রামকে সংহতি জানিয়েছিলেন। সভ্যতা ও সাম্রাজ্যবাদের মুখোশধারী বিদেশী শাসনের কদর্য ও ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করে মহান কবি ও মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করে ৩১ মে, ১৯১৯ তৎকালীন ভাইসরয়কে লিখেছিলেন, "... হতভাগ্য জনগণের উপর যে অপরিমেয় নিষ্ঠুর নির্যাতন নামিয়ে আনা হয়েছে এবং এজন্য যে পদ্ধতি সমূহ অবলম্বন করা হয়েছে, আমি নিশ্চিত সভ্য সরকারগুলির ইতিহাসে এর কোনো পূর্ব নজির নেই ... এমন একটা সময় এসেছে যখন সম্মান সূচক চিহ্নগুলি আমাদের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ আমরা একটি সীমাহীন অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে পতিত রয়েছি। এই কারণে, আমি আমার পক্ষ থেকে, সকল সামাজিক মর্যাদামুক্ত হয়ে আমার দেশবাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চাই। আমার এই দেশবাসী আসলে যাইহোক না কেন, খুবই তুচ্ছ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে।

মানুষের পক্ষে অনুপযুক্ত ও সহ্যাতীত অপমান ভোগ যাদের নিয়তি আমিও তাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে চাই।" এরপর থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলগুলি ক্রমশঃ গণচরিত্র অর্জন করতে থাকে। শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষক-সাধারণ জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ এক অন্য তাৎপর্য এনে দেয়।

২১ বছর পরে ১৯৪০ সালের ১৩ মার্চ পনেরো বছরের এক পিতৃমাতৃহীন তরুণ উধম সিং, যে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছিল সে লন্ডনে ফ্যাকস্টন হলে পাঞ্জাবের তৎকালীন গর্ভনর মাইকেল ও ডয়েরকে গুলি করে হত্যা করে। বিচারে তাঁর মৃত্যু দণ্ড হয় এবং তা ১৯৪০ সালের ১২ জুন কার্যকরী হয়। মৃত্যুর কালে সে বিবৃতি দিয়ে জানায়, "I did it because I had a grudge against him. He deserved it. He was the real culprit, he wanted to crush the spirit of my people, So I have crushed him."

... I am dying for my country ... it was my duty. What greater honour could be bestowed on me than death for the sake of my motherland." জেনারেল ডায়ার এর অনেক আগেই ১৯২৭ সালে মারা যান।

ভগৎ সিং-এর বয়স ছিল তখন বারো বছর। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড যখন ঘটে তখন তিনি ছিলেন লাহোরে। পরে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার রক্তরঞ্জিত মাটি নিয়ে যান যা আজও ভগৎ সিং স্মারক সংগ্রহালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে। এই হত্যাকাণ্ড ভারতবর্ষের তরুণ বিপ্লবীদের গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না সেইসব বিপ্লবীদের যাঁরা অভাব থেকে মুক্তির জন্য, ক্ষুধা থেকে মুক্তির জন্য, দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য, বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য, জাতিভেদ থেকে মুক্তির জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ— তাঁদের কাছে এক অনুপ্রেরণার উৎসস্থল যে জন্য তাঁরা এক সুন্দর সুস্থ মুক্ত পৃথিবীর জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা? বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?" □

দিল্লীর কনভেনশনে আহ্বান

৮, ৯ জানুয়ারি ২০১৯ দুদিনের ধর্মঘটে স্তব্ধ হবে গোটা দেশ

গত ২৮ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীর মবলঙ্কর হলে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সর্বভারতীয় ফেডারেশন সমূহের যৌথ জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন থেকে দেশের সমগ্র শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের শ্রমিকবিরোধী ও জনবিরোধী নীতি সমূহের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ৮ ও ৯ জানুয়ারি দুদিনের সর্বভারতীয় ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে।

দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এই জাতীয় কনভেশনের আহ্বান করেছিল। এই ট্রেড ইউনিয়নগুলি হলো সি আই টি ইউ, আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস, এ আই ইউ টি ইউ সি, টি ইউ সি সি, এ ই ডব্লু এ, এ আই সি সি টি ইউ, এল পি এফ ও ইউ টি ইউ সি। উক্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির অনুমোদিত ইউনিয়ন সমুহের এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বাধীন জাতীয় ফেডারেশনগুলির জাতীয় ও রাজ্যস্তরের হাজারেরও বেশী নেতৃত্ব-কর্মী এই কনভেশনে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক, প্রতিরক্ষা, রেলওয়ে, বীমা, ব্যাঙ্ক এবং টেলিকম কর্মচারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দও কনভেনশনে অংশ নেন।

২০০৯ সাল থেকে এই সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে একটানা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এটা স্মরণীয় যে, বিজেপি-আর এস এস দ্বারা পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন বি এম এস কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই যৌথ আন্দোলন থেকে বেড়িয়ে যায়। তারা এর সপক্ষে যুক্তি দিয়েছে যে, মোদি সরকার শ্রমিকদের দাবিসমূহের প্রতি অনেক বেশী ইতিবাচক। এই দাবির কোনো যৌক্তিকতা যদিও গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষ খুঁজে পাননি। যে ১২ দফা দাবিতে এই ধর্মঘট, সেই দাবিগুলি বি এম এস সহ সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছিল। দেশী বিদেশী কর্পোরেট প্রভুদের স্বার্থে বিজেপি সরকারের বেপরোয়া কার্যকলাপ ও নীতি প্রনয়নের বিরোধিতা বি এম এস ও করতে বাধ্য হচ্ছে। আসলে তাদের পরিচালক উগ্র-হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের চাপেই বি এম এস এই যৌথ আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে।

২৮ সেপ্টেম্বরের কনভেনশনে যৌথ ঘোষণাপত্র পেশ করেন আই এন টি ইউ সি-র সভাপতি ডি সঞ্জীব রেড্ডি। এর সমর্থনে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন, উত্থাপিত ঘোষণা পত্রকে সমর্থন জানিয়ে সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক তপন সেন বলেন, 'সব কা বিকাশ' শ্লোগান দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলেও তাদের নীতিসমূহ নিপীড়িত জনগণ, দেশীয় উৎপাদন এবং আমাদের স্বনির্ভর অর্থনীতির 'বিনাশ'-এর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বিজেপিকে পরাজিত করতে শ্রমিকবিরোধী, দেশবিরোধী নীতিসমূহের পরিবর্তনের লক্ষ্যে যৌথ সংগ্রামকে শক্তিশালী করার উপর জোর দেন।

ঘোষণাপত্রের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ আই টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ কাউর, এইচ এম এস-র সাধারণ সম্পাদক হরভজন সিং সিধু, এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে সত্যবান, টি ইউ সি সি-র পক্ষে জি আর শিবশংকর, এস ই ডব্লু এ-র পক্ষে সোনিগাল, এল পি এ আই সি সি টি ইউ-র পক্ষে রাজীব দিসরি এল পি এফ-র পক্ষে পি ডি মুখ এবং ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে অশোক ঘোষ। কনভেনশন পরিচালনার জন্য গঠিত সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন অশোক সিং (আই এন টি ইউ সি), রাজেন্দ্র কুমার (এ আই টি ইউ সি), এস এন পাঠক (এইচ এম এস), হেমলতা (সি আই টি ইউ), আর কে শর্মা (এ আই ইউ টি ইউ সি), প্রবীর ব্যানার্জী (টি ইউ সি সি), লতা সিং (এস ই ডব্লু এ), সন্তোষ রাই (এ আই সি সি টি ইউ), কে নইরাজন (এল পি এ) এবং শত্রুজিত সিং (ইউ টি ইউ সি)। □

মানস কুমার বড়ুয়া

বেতন কমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বাঁকুড়া

আলিপুরদুয়ার

দক্ষিণ দিনাজপুর

উত্তর ২৪ পরগনা

মহিলা কনভেনশন (পূর্ব মেদিনীপুর)

গত ৮-৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ কলকাতায় কর্মচারী ভবন, অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত রাজ্য মহিলা কনভেনশানের পরিপ্রেক্ষিতে জেলাতে ৭ অক্টোবর ২০১৮ তমলুক কর্মচারী ভবনে মহিলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত কনভেনশনে ৪৫ জন মহিলা সহ মোট ৯৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সহ-সভাপতি কাজল পান্ডে ও চুয়া চক্রবর্তী। সভায় আলোচনা করেন রাজ্য কনভেনশনে উপস্থিত থাকা নেতৃত্বদ্বয় দিপালী পাখিরা ও দীপ্তি শতপতি। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নার্সেস সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শেফালী নস্কর, সর্বশেষ আলোচনা করেন জেলা সম্পাদক সুকুমার ভট্টাচার্য। □

পূর্ব মেদিনীপুরে আলোচনা সভা

পঞ্চম রাজ্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলায় ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ দুটি জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদ্বয়ের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ''স্বাধীনতা উত্তরকালে কর্মচারী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি'' বিষয়ে আলোচনা করেন মানস দাস, সহ-সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটি। দ্বিতীয় বিষয় ''মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐক্য রক্ষার সংগ্রাম'' বিষয়ে আলোচনা করেন দেবাশীষ মিত্র, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি।

সভায় ৭জন মহিলাসহ ১০৮ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতি সজল সরকার। □

সংগ্রামী হাতিয়ারের পাঠকসভা

গত ২৯ অক্টোবর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে জেলার কর্মচারী ভবনে সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার আগস্ট সংখ্যা নিয়ে পাঠকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জেলার কর্মী-নেতৃত্ব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য জেলাতেও এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন। □

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পূর্ণ সমর্থন

সচেতন, তারাই এই ধর্মঘট সফল করবেন। উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সঙ্কট আসলে সামাজিক সঙ্কট। তাদের পাশে না দাঁড়ালে সামাজিক ক্ষতি হয়। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনই পারে শ্রমিক বিরোধী মোদি সরকারকে অপসারণ করতে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এ রাজ্যে শ্রমজীবী মানুষ, সাধারণ মানুষের সাথে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও চরমভাবে আক্রান্ত। বেতনভাতা, পে-কমিশনের বঞ্চনা ছাড়াও কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সহ অন্যান্য অধিকার আক্রান্ত। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া কর্মচারীরা সংগ্রামের ময়দানে আছেন, ৮, ৯ জানুয়ারি'১৯-এর ধর্মঘটেও তাঁরা সামিল হবেন। প্রস্তাব সমর্থন করে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন— উজ্জ্বল চৌধুরী (রাজ্য সম্পাদক এ এ আই টি ইউসি), বাসুদেব বসু (এ আই সি সি টি ইউ), দীপক সাহা (ইউ টি ইউ সি), দিলীপ ভট্টাচার্য (এ আই ইউ টি ইউ সি), তপন দাশগুপ্ত (১২ই জুলাই কমিটি), কুলদীপ সিং (এইচ এম এস), দেবদাস চ্যাটার্জী (টি ইউ সি সি) জয়দেব দাশগুপ্ত (বিই এফ আই), পার্থ চন্দ্র (এ আই বি ই এ) এবং শিশির রায় (বি এস এন এল কো-অর্ডিনেশন কমিটি)। এই রাজ্য কনভেনশনে পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন সুভাষ মুখার্জী (সি আই টি ইউ), তাপস ভট্টাচার্য (এ আই টি ইউ সি), গণেশ সরকার (আই এন টি ইউ সি), অতনু চক্রবর্তী (এ আই সি সি টি ইউ), ভূপেন্দ্র চন্দ্র পাল রায় (এইচ এম এস), শান্তি ঘোষ (এ আই ইউ টি ইউ সি), তাপস দাস চৌধুরী (ইউ টি ইউ সি), সমীর ভট্টাচার্য (১২ই জুলাই কমিটি), অলোক নন্দী (বি এস এন এল কো-অর্ডিনেশন কমিটি), অশোক দাস (বি ই এফ আই), রাম অবতার প্রসাদ (টি ইউ সি সি) এবং বরেন্দ্রনাথ বসু (মার্কেন্টাইল ফেডারেশন)।

এই রাজ্য কনভেনশন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, শারদ উৎসবের পরই রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটের সমর্থনে নিবিড় প্রচারাভিযান শুরু হবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে শিলিগুড়িতে একটি পৃথক কনভেনশনে অনুষ্ঠিত হবে। ২৫ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বরের মধ্যে জেলাভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক যৌথ কনভেনশন সংগঠিত হবে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস জুড়ে শিল্পক্ষেত্রে যৌথসভা, কারখানায় গেট সভা ও মহল্লায় মহল্লায় সভা হবে। ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর যৌথভাবে ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধর্মঘটের নোটিশ জমা দিতে হবে। তবে নোটিশ প্রদানের সময়ক্ষণ সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির বাস্তবতা অনুযায়ী স্থির করতে হবে। □

মানস কুমার বড়ুয়া

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সামান্য ইতিহাসের জ্ঞান নিয়েও দুটি বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখ করা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথম প্রাসঙ্গটির কেন্দ্রে রয়েছেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। যিনি যাবতীয় মতান্তর সত্ত্বেও গান্ধীজীকে 'জাতির জনক' বলে শ্রদ্ধা করতেন। সেই সুভাষ চন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে গিয়ে বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুর্গম পথ ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান সংগঠিত করেছিলেন। এগিয়ে এসেছিলেন কোহিমা পর্যন্ত। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যেমন সব ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন, তেমনই আজাদ হিন্দ বাহিনীতেও ঠাঁই হয়েছিল সব ধর্মের মানুষেরই। গান্ধীজীর মতই নেতাজির পথও বিতর্কের উর্ধ্বে ছিল না। কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর দুর্জয় সাহস, প্রাক স্বাধীনতা পর্বেই স্বাধীন ভারত সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা— না এগুলির কোন কিছুকেই গান্ধীজী প্রকাশ্যে প্রশংসা করেছেন বলে কখনও শোনা যায়নি।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবী যতীন দাসকে কেন্দ্র করে। আমরা সকলেই জানি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের অন্যতম উপাদান ছিল 'অনশন'। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তিনি তিরিশবার অনশন করেছেন। অথচ বিপ্লবী যতীন দাস যখন কারাগারে ৬৩ দিন অনশন করে মারা যান, গান্ধীজী সেই অনশনকে 'diabolical suicide' বা 'শয়তানসুলভ আত্মহত্যা' বলে মন্তব্য করেন কেন? জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনশন না ভেঙ্গে মৃত্যুবরণ করে যতীন দাস কি তাঁকে ছাপিয়ে গেছিল বলে কি গান্ধীজী মনে করেছিলেন?

সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতা গান্ধীজীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আরও একটি সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা যেতে পারে। তা হল, শ্রেণী সংগ্রাম বা শ্রেণী আন্দোলন ছিল গান্ধীজীর ঘোর অপছন্দের বিষয়। একথা যেমন ঠিক যে, তিনি পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হবার পরেই কংগ্রেসের নেতৃত্বে গ্রাম ও শহরের গরীব মানুষ, শ্রমিক ও কৃষক স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। তেমনই একথাও ঠিক, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি, শ্রমিক-কৃষকরা যখনই পুঁজিপতি, জমিদার ও জোতদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই করেছে, গান্ধীজী সেই লড়াইকে কখনও সমর্থন করেননি। যেমন তৎকালীন বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত শোলাপুরে ৪০ হাজার শিল্প শ্রমিকের দুর্বার জঙ্গী আন্দোলনের খবর পেয়ে গান্ধীজী হরিজন পত্রিকার ৩০ নভেম্বর (১৯৩০) সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। যার শিরোনাম ছিল, ''Storm Signals''। এই প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, ''The Sholapur affairs and the labour unrest in Kanpur and Ahmedabad show how uncertain is the congress control over the forces of disorder... .It is said that the red flag men, communists have been at work among the men in sholapur settlement ... why are we living in Ahmedabad and Kanpur in perpetnal dread or highthing or unauthorised strikes? Is the congress unable to influence organised labour in the right direction?''

শ্রমিক কৃষকের শ্রেণী আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজীর এই দ্বিধা ও অনীহা মনে করিয়ে দেয়, তৃতীয় আন্তর্জাতিক তথা কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের Anti-colonial Thesis কে। যেখানে লেনিন বলছেন, ''The aim of bourgeois nationalism is smiply to achieve independence and nothing more. The capitalist path is inseperably wedded to it.''

উপসংহার ঃ গান্ধীজীর জীবন যাপন, পোশাক-পরিচ্ছদ, নিয়মিত প্রার্থনা, মৌন দিবস পালন, অনশন ইত্যাদির সমন্বয়ে এক ঋষিসুলভ ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। যাঁর নামে জনতা জয়ধ্বনি দিত। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিন্তু তিনি সফল হতে পারলেন না। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ রুখতে পারলেন না, সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতাও দুর করতে পারলেন না। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে জিন্না'র সাথে পার্থক্য ছিল একটাই— জিন্না চেয়েছিলেন দেশভাগ করে স্বাধীনতা, আর গান্ধীজী চেয়েছিলেন স্বাধীনতার পর দেশভাগ। গান্ধীজী চেয়েছিলেন ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পাকাপাকিভাবে পাকিস্তানে চলে যাবেন। সেখানেই বসেই তিনি নতুন করে প্রয়োগ করবেন অহিংস, অসহযোগ আর আত্মশুদ্ধির তত্ত্ব। কিন্তু তাঁর সেই অভিলাষ পূর্ণ হল না। ১৯৪৮ সালে ৩০ জানুয়ারি নাথুরাম গডসের বন্দুক থেকে বেড়িয়ে আসা তিনটে গুলি কেড়ে নিল জননেতার প্রাণ। ইতিহাসের পরিহাস হল এটাই, গান্ধীজীর সার্ধশতবর্ষ যখন প্রতিপালিত হচ্ছে, তখন তাঁর হত্যাকারীর উত্তরসূরীরা কেন্দ্রে ক্ষমতায়। □

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮
নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কনভেনশনের ঘোষণাপত্র

১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ব্যাঙ্ক, বীমা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী দপ্তর, প্রতিরক্ষা উৎপাদনক্ষেত্র, টেলিকমসহ সমস্ত শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বাধীন জাতীয় ফেডারেশনগুলি যৌথভাবে শ্রমিকদের জাতীয় কনভেনশনের আহ্বান জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয়তা-বিরোধী কর্পোরেটমুখী অনুসৃত নীতিসমূহের কারণে জাতীয় অর্থনীতির অবনতির পরিস্থিতি এবং দেশজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের ওপর এর নিদারুণ প্রভাবে কনভেনশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

কনভেনশন সম্পূর্ণ নিরাশার সাথে উল্লেখ করছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ১২-দফা দাবিসনদকে ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে অবহেলা করেই চলেছে। দেশজোড়া অসংখ্য যৌথ ধর্মঘট যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ২০১৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর এবং ২০১৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট, যেখানে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ অংশ নিয়েছিলেন, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই কেন্দ্রের শাসকদল দেশজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা ও অধিকারসমূহের উপর আক্রমণ বৃদ্ধি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকশ্রেণির সংগঠিত আন্দোলনের এই ন্যায্য ও প্রকৃত দাবিসমূহের প্রতি সাড়া দিতেই শুধু যে অস্বীকার করেছে তা নয়— একইসাথে শ্রমিক-কর্মচারী এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারসমূহের উপর আক্রমণ বৃদ্ধি করেছে। দ্বিপক্ষীয় এবং ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থাকে খর্ব করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মজুরি মীমাংসায় সরকার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের উত্থাপিত বিষয়গুলি, যেমন নয়া-পেনশন প্রকল্প বাতিল, ভাতার পুনর্বহাল, এবং পেনশন সম্পর্কিত বিষয়গুলির মীমাংসায় চারটি সাব-কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করা হয়নি। এই কনভেনশন প্রতিরক্ষা, রেলওয়েসহ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির লড়াই-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছে এবং তাদের দাবিগুলিকে তুলে ধরছে।

আন্তর্জাতিক ফোরামগুলি সহ সমস্ত দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থা ও কমিটি থেকে দেশের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন আই এন টি ইউ সি-কে বাদ দেওয়ার বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক ও স্বৈরাচারী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছে এই জাতীয় কনভেনশন। এটা সমগ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর এক গভীর ও জঘন্য আক্রমণ ব্যতিরেকে অন্যকিছু নয়। এটার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবেই লড়াই করতে হবে।

বেশিরভাগ শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান তৈরি ঋণাত্মক পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় কর্মহীনতার পরিস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশাল কর্মচ্যুতির ভবিষ্যদ্বাণী এই পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিবছর নিয়মিতপদের ৩ শতাংশ বাধ্যতামূলকভাবে অবলুপ্তি হয়েই চলেছে। কর্মচারী সংগঠনগুলির এবং কিছু স্বাধীন সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, বিমুদ্রাকরণের পর প্রথম কয়েকমাসে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ক্ষুদ্র কারখানা বন্ধের সাথে সাথে ৭০ লক্ষ কাজ নষ্ট হয়েছে। তার সাথেই অপ্রথাগত অর্থনীতির প্রায় আরো ৬ কোটি মানুষের জীবনযাত্রা আক্রান্ত হয়েছে।

পেট্রোপণ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বোঝা বাড়িয়েছে। জি এস টি এই দুর্দশাকে আরো একপ্রস্ত বৃদ্ধি করেছে। এমনকি জীবনদায়ী ওষুধও অত্যাধিক জি এস টি-র আওতায় এসেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে এবং কল্যাণমূলকখাতে ব্যাপকভাবে সরকারি ব্যয় কাট-ছাঁট করায় পরিস্থিতি বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়েছে। সরকারের ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্টের প্রবর্তন আসলে পিছনের দরজা দিয়ে আধুনিক শ্রমদাস ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এটা অ্যাপ্রেনটিসেস অ্যাক্ট-এ মালিকস্বার্থাভিমুখী পরিবর্তন নিয়ে আসবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের সমকাজে সমবেতনের নীতিকে কার্যকরা করা এবং ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ মতো প্রকল্প শ্রমিকদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে এই সরকারের শ্রম-বিরোধী স্বৈরাচারী চরিত্র আরো প্রকট হয়েছে। এমনকি সমকাজে সমমজুরি ও সুবিধাপ্রদান এবং ই পি এস-১৯৯৫-র ভিত্তিতে প্রকৃত বেতন ও মহার্ঘ্যভাতার হিসাব ও প্রদানের সুপ্রিম কোর্টের রায়কেও এই সরকার রূপায়ণ করছে না।

দলমত নির্বিশেষে দেশের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই সরকার আগ্রাসীভাবে মালিকমুখী এবং সম্পূর্ণভাবে শ্রমিক-বিরোধী শ্রমআইন সংস্কারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শ্রমিকদের কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত ৪৪টি কেন্দ্রীয় শ্রমআইনকে চারটি শ্রমকোডের (Labour Code) আওতায় নিয়ে আসা হবে এবং এর মধ্য দিয়ে ব্যবসাকে আরো সহজীকরণ করার নামে মালিকপক্ষকে যখন খুশি নিয়োগ এবং ছাঁটাইয়ের সুবিধা করে দেয়া হবে। সম্প্রতিকতম 'কোড অন সোস্যাল সিকিউরিটি' বর্তমানে ১৫টি সামাজিক আইনকে অকেজো করে দিয়েছে কিংবা অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। কল্যাণমূলক সেসের অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। কল্যাণমূলক সেসের অবলুপ্তি ঘটেছে, সামাজিক সুরক্ষা তহবিল যেখানে শ্রমিকদের দেওয়া ২৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি রয়েছে তা অন্যায়ভাবে দখল নিয়ে শেয়ার মার্কেটে ফাটকাবাজির কাজে লাগানো হবে। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবিত কোডটি খুবই বিপজ্জনক।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, ব্যাঙ্ক, বীমা, রেলওয়ে, জল পরিবহন, তেল, বিদ্যুৎ, কয়লা প্রভৃতি স্ট্র্যাটেজিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ, বেসরকারি ক্ষেত্রের স্বার্থে আউট-সোর্সিং, বহু গুরুত্বপূর্ণ এবং স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ছাড়পত্র দেওয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণের রূপরেখা গত সাড়ে ছয় দশক ধরে গড়ে ওঠা এই ক্ষেত্রে উৎপাদনব্যবস্থা ও গবেষণার উদ্যোগকে ধ্বংস করবে। ৫০ শতাংশের বেশি অস্ত্রশস্ত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি এতদিন অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিগুলিতে তৈরি হতো, এখন তা আউট-সোর্স হবে। সরকার স্থির করেছে, আমাদের সৈন্য ও অফিসাররা ব্যবহার করেন এইরকম পাঁচটি অর্ডিন্যান্স ফ্রাক্টরিতে উৎপন্ন দ্রব্য আর সেখানে তৈরি করা হবে না।

রেলের সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ ক্রমে ক্রমে করা হচ্ছে। রেলের দ্বারা তৈরি রেললাইনে বেসরকারি ট্রেন চলানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। বেসরকারি বগি, ওয়াগান এবং ইঞ্জিনগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেলওয়ে ইয়ার্ড, শেড ও ওয়ার্কশপগুলিকে বিনা ব্যায়ে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে মেট্রোশহরগুলির ২৩টি স্টেশনকে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে বেসরকারি হাতে তুলে দেয়ার জন্য। ৬০০-র বেশি রেলস্টেশন এবং তার চারিদিকের রেলের জমি বেসরকারি সংস্থার দ্বারা উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তৈরি করা হয়েছে, যারা বেসরকারি মুনাফাবাজদের সুবিধার্থে রেলের যাত্রীভাড়া ও পণ্য মাশুল বৃদ্ধির বিষয়টি স্থির করবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে, মোটর ভেহিকেল (সংশোধন) বিল পাশ করে জনপরিহবন ক্ষেত্রকে পাইকারিহারে বেসরকারিকরণের অনুমতি প্রদান করা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিও ব্যাপক আক্রমণের মধ্যে রয়েছে, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে বেসিরকারিকরণ। যে বেসরকারি সংস্থাগুলির অনাদায়ী ঋণের জন্য ব্যাঙ্কগুলি গভীর সংকটে পড়েছে, তাদেরই অন্যায়ভাবে সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে সরকার। এমনকি বিজয় মাল্য, নীরব মোদি এবং মেহুল চোকসি জনগণের টাকা নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার পরও এসব করা হচ্ছে। কর্পোরেট ঋণখেলাপীদের সুবিধা করে দিতে 'রেজোলিউশন প্রসেস ইলসলভেনসি' নামে 'ইনসলভেনসি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড' চালু করেছে সরকার। এর মধ্য দিয়ে বকেয়া ঋণের মাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশ ব্যাঙ্ক ফেরত পাবে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের দ্বারা সংগঠিত বিভিন্ন কেলেঙ্কারির প্রকাশ শাসকচক্রীদের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচন করে দিয়েছে। সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারি রাফালে বিমান ক্রয় প্রকাশ্যে এসেছে।

সংগ্রামী কৃষকদের এবং আদিবাসীদের স্বার্থে বনাঞ্চল অধিকার আইনের কার্যকর রূপায়ণের দাবিতে আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করছে এই কনভেনশন। সরকারি প্রশাসনের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্প্রদায়িক ও বিভাজনকামী সংগঠনগুলির বাড়বাড়ন্ত এবং তাদের কর্মসূচি প্রসারের বিরুদ্ধেও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছে এই জাতীয় কনভেনশন। বিরোধীমতকে দমন করতে এবং বিরোধী মতাবলম্বী ব্যক্তিদের হেনস্থা করতে বিজেপি সরকার দানবীয় ইউ এ পি এ, এন এস এ-সহ সি বি আই, এন আই এ প্রভৃতি সংস্থাগুলিকে কাজে লাগাচ্ছে। এটা শ্রমিক ও নিপীড়িত মানুষের ঐক্যকে ব্যাহত করছে। তাই ১২-দফা দাবিতে চলা এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন সবচেয়ে জরুরি। শ্রমিকশ্রেণি তার প্রতিবাদী স্বরকে অবশ্যই তুলে ধরবে।

এই জন-বিরোধী, জাতীয়তা-বিরোধী নীতি-শাসনকে অবশ্যই পরাজিত করতে হবে। একইসাথে এই নীতিসমূহের জনমুখী পরিবর্তনে চাপ সৃষ্টি করতে হবে এবং এজন্য শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ মঞ্চকে অবশ্যই আরেকবার সংগ্রামকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। শ্রমিকদের জাতীয় কনভেনশন নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করছে। ● **রাজ্য, জেলা এবং শিল্পক্ষেত্রভিত্তিতে যৌথ কনভেনশন ২০১৮ সালের অক্টোবর/নভেম্বরের মধ্যে সংগঠিত করতে হবে।** ● **২০১৮ সালের নভেম্বর/ডিসেম্বরে শিল্পভিত্তিতে কারখানার গেটে যৌথ মিটিং, সমাবেশ করা হবে।** ● **২০১৮ সালের ১৭-২২ ডিসেম্বর যৌথভাবে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান।** ● **২০১৯ সালের ৮-৯ই জানুয়ারি দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘট।**

দলমত নির্বিশেষে দেশের সমস্ত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষকে উপরিউক্ত কর্মসূচিগুলি সম্পূর্ণ সফল করতে জাতীয় কনভেনশন আহবান জানাচ্ছে। □

বিদ্যুৎপৃষ্ট সাধারণ মানুষ

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আধুনিক জীবন বিদ্যুৎ ছাড়া অচল। তাই বিদ্যুতের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য মানবাধিকার হিসেবে আবিশ্ব স্বীকৃত। স্বভাবতই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের মতই সুলভে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, আধুনিক রাষ্ট্রের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। যার জন্য প্রয়োজন জনমুখী বিদ্যুৎ নীতি আবার উল্টোদিক থেকে দেখলে, একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কারণে বিদ্যুতের বিপুল পরিমাণ চাহিদার জন্যই, এটি কর্পোরেটদের কাছে একটি লোভনীয় ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারলেই মুনাফা লোটার নিশ্চিত সুযোগ তৈরি হয়। তাই নয়া উদারবাদী অর্থনীতির আমলে এই ক্ষেত্রটিকে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য রাষ্ট্রের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। রাষ্ট্রও কর্পোরেট পুঁজির আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করার জন্য এই ক্ষেত্রটিকেও উন্মুক্ত করে দিতে থাকে। যার প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের ওপর। নিত্যব্যবহার্য বিদ্যুৎ সুলভ থেকে ক্রমশ মহার্ঘ হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিদ্যুতের বিল মেটাতে নাভিশ্বাস ওঠে গরীব ও মধ্যবিত্তের।

তৃণমূল সরকারের আমলে সি ই এস সি এলাকায় বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি

২০১০-২০১১	৪ টাকা ৭৩ পয়সা (২০১১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ২০০ ইউনিটের উপর বামফ্রন্ট ভর্তুকি দিয়েছিল)
২০১১-২০১২	৫ টাকা ৮৮ পয়সা
২০১২-২০১৩	৬ টাকা ৩ পয়সা
২০১৩-২০১৪	৬ টাকা ১০ পয়সা (৮৮ পয়সা MVCA যুক্ত হয়েছিল)
২০১৪-২০১৫	৬ টাকা ৯৭ পয়সা (১ পয়সা দাম কমেছে)
২০১৫-২০১৬	৬ টাকা ৯৯ পয়সা
২০১৬-২০১৭	৭ টাকা ০২ পয়সা (২৭ জানুয়ারি, ২০১৮ MVCA বাবদ ২৯ পয়সা প্রতি ইউনিটে বৃদ্ধি পেয়েছে)

MVCA : Multi variable cost adjustment

ঠিক এই ঘটনা ঘটছে আমাদের দেশেও। ২০০৩ সালে বিদ্যুৎ আইনে আমাদের দেশে বেসরকারী ক্ষেত্রকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য খুলে দেয়া হয়। এর ফলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন রইল না। বেসরকারী সংস্থা বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ পেলে, অপরিকল্পিতভাবে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু রাখে। চাহিদার সাথে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। ফলে উৎপাদন ক্ষমতার বড় অংশই অনুৎপাদক সম্পদে পরিণত হয়। যেমন আমাদের দেশে সর্বোচ্চ চাহিদা ১ লক্ষ ৬৪ হাজার মেগাওয়াট। অথচ বর্তমানে সর্বমোট উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার মেগাওয়াট। উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা কম হওয়ায়, বেসরকারী উৎপাদকরা প্ল্যান্ট বন্ধ রাখছে। প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর ক্রমশ নিম্নমুখী। এর মধ্যে দিয়ে আর একটা বিষয় বোঝা যায় তা হল, দেশে শিল্প বিকাশের হারও নিম্নমুখী। স্বাধীনতার পরেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বিদ্যুতের গুরত্ব উপলব্ধি করে, ভারত সরকার পরাধীন ভারতের আইন 'ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট', ১৯১০-এর পরিবর্তন করে 'ইলেকট্রিসিটি (সাপ্লাই) অ্যাক্ট' ১৯৪৮ নামে নতুন আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে বিদ্যুৎকে সর্বজনীন ব্যবহারের সামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই আইনের মাধ্যমেই রাজ্যে রাজ্যে বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠিত হয়। সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় বিদ্যুৎকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (১৪৬ নং ধারা)। রাষ্ট্র যেহেতু তখন জনকল্যাণকামী, তাই ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব অংশের মানুষ যাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারেন, তার জন্য নতুন আইনে পারস্পরিক ভর্তুকির ব্যবস্থা রাখা হয়। পারস্পরিক ভর্তুকি হল এমন একটি ব্যবস্থা, যে ভর্তুকি সরকারকে দিতে হয় না। উৎপাদনের গড় দাম ধরে তার থেকে কম দামে কম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকদের দেয়া হয়। আর বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের গড় দামের থেকে বেশী দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গড় দাম উশুল করা সম্ভব হয়। এর ফলে গরীব মানুষের পক্ষেও প্রয়োজন মতন বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলিও বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিয়োজিত পুঁজির থেকে মাত্র ৩ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটাতে পারত। ফলে প্রায় উৎপাদন খরচের দামেই বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পেতেন সাধারণ মানুষ। স্বাধীনতার সময় যারা ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো ১৩৬২ মেগাওয়াট। আর ২০০৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১.৩৩ লক্ষ মেগাওয়াটে। এর মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ ছিল বেসরকারী উৎপাদন। ১৯৪০ সালের আইনে বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠনের কথা বলা হলেও, দাম নির্ধারণের প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ফলে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ দাম নির্ধারণ করলেও সরকারের মতামত ছিল গুরুত্বপূর্ণ। চাইলে সরকার মানুষের স্বার্থে পরিবর্তনও করতে পারত। যেমন আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্টের আমলে এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। বামফ্রন্ট সরকার পারস্পরিক ভর্তুকির সুফল যাতে কম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীরা পান, সেদিকে তাকিয়ে রাজ্য বিদ্যুৎপর্ষদ ও সিইএসসি-র দাম বৃদ্ধির প্রস্তাবকে পরিবর্তন করেছে বা স্থগিত রেখেছে।

বামফ্রন্টের আমলে সি ই এস সি এলাকায় বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি

২০০৩-২০০৪	৪.১৫ টাকা
২০০৪-২০০৫	৪.০৩ টাকা (কমে গেল)
২০০৫-২০০৬	৩.৮১ টাকা
২০০৬-২০০৭	৩.৭৪ টাকা
২০০৭-২০০৮	৩.৮৬ টাকা
২০০৮-২২০৯	৩.৯১ টাকা
২০০৯-২০১০	৪.৫৬ টাকা

বিদ্যুৎ ক্ষেত্র থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারে কাজটা শুরু করে বিজেপি জোট সরকার ১৯৯৮ সালে। বিদ্যুৎ নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে 'বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন' গঠন করা হয়। আমাদের রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তখন ঐ জোট সরকারের মন্ত্রী। তিনিও দু'হাত তুলে বিদ্যুৎ বেসরকারীকরণের প্রথম ধাপটিকে সমর্থন করেন। বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হল 'বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন'কে এবং ঐ সংস্থাকে বিচার বিভাগীয় সংস্থার মর্যাদা দেয়া হয়। আমাদের রাজ্যে ২০০১ সালে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন পারস্পরিক ভর্তুকি প্রথা তুলে দিতে চায়। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করে এই ব্যবস্থা চালু রাখে।

২০০৩ সালে বিজেপি জোট সরকার ১৯৯৮ সালে প্রণীত আইনকে সংশোধন করে, সরকারী হস্তক্ষেপের সুযোগকে আরও সঙ্কুচিত করে। এই আইনে বলা হল কোন রাজ্য সরকার যদি সমাজের কোন অংশকে ভর্তুকি দিতে চায় তাহলে, সেই ভর্তুকির টাকা সম্পূর্ণত আগাম পরিশোধ করতে হবে। সেই সময়েও ঐ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু টুঁ শব্দ করেননি। ২০১০-১১ সালে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সি ই এস সি এলাকার জন্য বিদ্যুতের বর্ধিত দাম ঘোষণা করলে, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার মাসে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের জন্য ১২০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়। ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের সরকারী ডিউটি মকুব করা হয়।

২০০৪ সালে বামপন্থীদের সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে ইউপিএ সরকার গঠিত হলে, ২০০৩ সালে আইনের সংশোধন করে, বিপিএল তালিকাভুক্তদের ক্ষেত্রে ৩০ ইউনিট পর্যন্ত অর্ধেক দামে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে (ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট ২০০৭)।

কিন্তু ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে মোদি সরকার পুনরায় বিদ্যুৎ আইনের সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল ২০১৪-য় বলা হয়েছে পারস্পরিক ভর্তুকি সম্পূর্ণ তুলে দেয়া হবে। শুধু তাই নয়, এই আইন কার্যকরী হলে, বিদ্যুৎ লাইন সংযোগকারী ও বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা হবে পৃথক। অর্থাৎ বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য দুটি কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। গ্রাহকের হেনস্থা বাড়বে। বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে দুটি কোম্পানীর মধ্যে টানাপোড়েন চলবে। একটি কোম্পানী মিটার রিডিং নেবে, অপর কোম্পানী বিল করবে। বিল আর রিডিং-এ গরমিল হলে কে সমাধান করবে, আইনে বলা নেই। বিভিন্ন কোম্পানি কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতিযোগিতা চালাবে। ফলে বিঘ্নিত হবে বিদ্যুৎকর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা।

তৃণমূল আমলে সি ই এস সি-র মুনাফা

২০১১ সালে ৪৮৮ কোটি টাকা
২০১২ সালে ৫৫৪ কোটি টাকা
২০১৩ সালে ৬১৮ কোটি টাকা
২০১৪ সালে ৬২৫ কোটি টাকা
২০১৫ সালে ৬৯৮ কোটি টাকা
২০১৬ সালে ৮৪৫ কোটি টাকা
২০১৭ সালে ৮৬৩ কোটি টাকা

বিদ্যুৎক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বেসরকারীকরপণের লক্ষ্যে আনীত এই বিলের বিরুদ্ধে ৭ ডিসেম্বর ২০১৮ দেশজুড়ে ধর্মঘটে শামিল হবেন বিদ্যুৎকর্মীরা। □

সুমিত ভট্টাচার্য

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
47th Year, 5-6th Issue, September-October 2018

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

সার্ধ শতবর্ষে (১৮৬৮-২০১৮) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সুমিত ভট্টাচার্য

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অগ্রগণ্য নেতা ছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তথা গান্ধীজী। যিনি মহাত্মা গান্ধী নামেও বিশেষ পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। 'গান্ধীজী' সম্মানসূচক একটি সম্মোধন। যার মধ্যে ব্যতিক্রমী কোন উপাদান নেই। কারণ ভারতীয় রাজনীতির জগতে বহু উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা বলা যায়, যাঁদের নামের অথবা পদবীর শেষে 'জী' শব্দটি যুক্ত হয়েছে এবং সেইভাবেই তাঁরা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। অবশ্য তার মানে এটা নয় যে, এঁরা সকলেই গান্ধীজীর সমপর্যায়ভুক্ত। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন গান্ধীজী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদিও তাঁর রাজনৈতিক ও জীবন দর্শন, তাঁর মত ও পথের চূড়ান্ত কার্যকারিতা বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে, তবুও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষার্ধ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত, তাঁহার পাহাড় প্রমাণ উপস্থিতি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই বিষয়ে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করা যেতে পারে, তবে তার আগে তাঁর অপর একটি পরিচিতি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে নেওয়া নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রচলিত ধারণা হলো, গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' বলে প্রথম সম্বোধন করেছিলেন বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটা ঠিকই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' বলে সম্মোধন করতেন এবং গান্ধীজী তাঁকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করতেন। এই সম্বোধনের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় উভয় উভয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এবং এই পারস্পরিক শ্রদ্ধা তাঁদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। যদিও বেশকিছু বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতের অমিল ছিল। বিশেষত, গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের কার্যকারিতা সম্পর্কে কবি সন্দিহান ছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর মত পত্রের মাধ্যমে গান্ধীজীকে জানিয়েও ছিলেন। তবুও, একথাও ঠিক তাঁদের কোনো কোনো বিষয়ে মতান্তর কখনও মনান্তরে পরিণত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে গান্ধীজী যেমন শান্তিনিকেতনে গেছেন, তেমনই রবীন্দ্রনাথও গান্ধীজীর সবরমতি আশ্রমে (গুজরাট) গেছেন তাঁর সাথে দেখা করতে। দু'জনের জীবনের লক্ষ্য, কর্মকাণ্ড ও প্রয়োগের ক্ষেত্র সবকিছুই আলাদা হওয়া সত্ত্বেও, পারস্পরিক শ্রদ্ধার জায়গাটা তৈরী হয়েছিল জীবনাদর্শের ঐক্যমত্য থেকেই। উভয়েই আশ্রমিক পরিবেশ, নিয়মতান্ত্রিক পরিসরে আত্মিক উন্নতির উপর বিশেষ জোর দিতেন। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ, দু'জনেই বিশ্বাস করতেন আত্মসংযম ও আত্মশক্তির বিকাশে পল্লী পরিবেশ বিশেষ সহায়ক হতে পারে। তবে গান্ধীজী যেমন শহরকেন্দ্রীক সভ্যতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা ছিলেন না। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি নির্ভর সভ্যতার বিকাশকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিলেও, এর মানবতা বিবর্জিত দিকগুলি তাঁকে ব্যথিত করত, ক্ষুব্ধ করত।

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে, যেখান থেকে আলোচনা শুরু হয়েছিল সেখানেই আমরা ফিরে যেতে পারি। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' সম্বোধন করলেও, এই বিশেষণটি তাঁর দেওয়া নয়। ১৮৯৩ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন এবং সে দেশের অমানবিক বর্ণবিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর বর্ণবিদ্বেষবাদ বিরোধী ভূমিকায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, ঐ দেশের 'গোন্ডালা রসশালা' নামে এক আয়ুর্বেদিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জয়রাম শাস্ত্রী তাঁকে 'মহাত্মা' আখ্যা দেন। তেমনই রবীন্দ্রনাথের 'গুরুদেব' উপাধিটিও গান্ধীজীর দেওয়া নয়। শান্তিনিকেতনের সূচনা পর্বে শিক্ষক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করেন। পরবর্তী পর্বে শান্তিনিকেতনের সকল আশ্রমিকই তাঁকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করতেন। তবে রবীন্দ্রনাথের গুরুদেব বিশেষণটি শান্তিনিকেতনের পরিসরের বাইরে খুব বেশী জনপ্রিয় না হলেও, গান্ধীজীর মহাত্মা বিশেষণটি কিন্তু আবিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েছিল। মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলা এবং এমনকি হো-চি-মিনও তাঁকে মহাত্মা গান্ধী বলেই সম্বোধন করতেন।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শন

গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শন, তার প্রয়োগের জটিলতা, তার কার্যকরিতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের সুযোগ থাকলেও, একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, গান্ধীজী এক স্বতন্ত্র ধারার রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। ঔপনিবেশিক দেশে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের নিশ্চয়ই লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু শুধুমাত্র তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলনের ধারাতেই স্বাধীনতা এসেছিল, একথা বলা হবে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। দ্বিতীয়ত, তাঁর আজীবন লালিত বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের স্বপ্নও দেখতেন। এমনকি তিনি নাকি একথাও বলতেন, যে দেশভাগ করতে হলে, তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে তা করতে হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও দেশভাগ হয়েছিল। স্বভাবতই তাঁর সৃষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল একথা বলা যাবে না। কিন্তু শুধুমাত্র সেই কারণে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় না। গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি ছিল 'সত্যাগ্রহ', প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তা ছিল অহিংস আন্দোলন বা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের হিংসা বিবর্জিত পথ। ঔপনিবেশিক শক্তি বিরোধী অহিংস আন্দোলনের অতিরিক্ত উপাদান ছিল অসহযোগ প্রক্রিয়া। এই সত্যাগ্রহ নির্ভর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃতি কি একান্তই ভারতীয়? নাকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর চিন্তা? বিশেষত, গান্ধীজীর 'অহিংস' উপায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার উৎস কী? অনেকে বলেন, গুজরাটে জন্মসূত্রে লব্ধ বৈষ্ণব ও জৈন সংস্কৃতির প্রভাবেই তিনি এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যা আংশিক সত্য হলেও, সর্বাংশে হয়ত সত্য নয়। কারণ তাঁর আত্মজীবনী অনুযায়ী, তিনি এই উপদেশ পেয়েছিলেন 'বাইবেল'-এর 'নিউটেস্টামেন্ট'-এর 'সারমন অফ দ্য মাউন্ট' পাঠ করে। এই খ্রিস্টীয় উপদেশের সাথে তিনি সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন 'শ্রীমদ্ভগবত গীতার'। যদিও গীতায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান নিশ্চয়ই গান্ধীজী মেনে নিতে পারেননি। কারণ সেই ধর্মযুদ্ধে হিংসার বহিঃপ্রকাশ ছিল ষোলোআনা। অর্থাৎ গান্ধীজী পশ্চিমী রাষ্ট্রনীতির বিকল্প একটি নীতির নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, একথা যেমন ঠিক, তেমনই একথা ঠিক যে তাঁর এই প্রতিনির্মাণ শুধুমাত্র প্রাচ্যের প্রাচীন দার্শনিক ভাবনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। নিউটেস্টামেন্টের পাশাপাশি, তাঁর বিভিন্ন রচনায় গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেও গীতার মতই তিনি সবটা গ্রহণ করেননি। কারণ বৌদ্ধ দর্শনের মূল ভাবনা হল 'মোক্ষ' বা 'চরম মুক্তি'। কিন্তু গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শন ছিল প্রবলভাবে বাস্তববাদী। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও, তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে তিনি 'ঈশ্বরতত্ত্ব' বা 'মেটাফিজিক্স'-কে প্রশ্রয় দেননি। ব্যক্তি জীবনে গান্ধীজী ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন, তাই আস্তিক। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আস্তিকতাবাদী দর্শনের মূল সুরের সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য ছিল। কারণ ঐ সমস্ত দর্শনের মূল ভাবনা হল 'ঈশ্বরই সত্য, সত্যই ঈশ্বর'। কিন্তু গান্ধীজী 'সত্য'কে ঈশ্বরের উপর স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর কথায় একজন নাস্তিকও সত্যাগ্রহী হতে পারেন, কিন্তু সত্যের প্রতি দৃঢ়সঙ্কল্প নন এমন কেউ, ঈশ্বরের বিশ্বাস করলেও সত্যাগ্রহী হতে পারেন না। সত্যাগ্রহ মানে সত্যের প্রতি আগ্রহ। এখানে সত্য মানে শুধু Honesty নয়। 'সত্য' বলতে গান্ধী বোঝাতেন এক ধরনের সদর্থক অস্তিত্ব অর্থাৎ লক্ষ্যবিহীন, অনুভবহীন, উপলব্ধিহীন কোন জীবন নয়।

কোন প্রাচ্য দর্শনের প্রেরণায় কিন্তু গান্ধীজী মনেপ্রাণে সত্যাগ্রহী হয়ে ওঠেননি। তাঁর এই জীবন দর্শনের উৎস ছিল প্রখ্যাত রাশিয়ান সাহিত্যিক লিও তলস্তয়ের রচনা 'দ্য কিংডম অফ গড উইদিন ইউ'। ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত এই বইটিতো গান্ধীজী পাঠ করেইছিলেন। সাথে সাথে পাঠ করেছিলেন, ১৯০৮ সালে তারকনাথ দাসকে লেখা তলস্তয়ে চিঠি— 'লেটার টু এ হিন্দু' (এটি বই আকারে এখনও পাওয়া যায়)। এই চিঠিতেই তলস্তয় ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 'অহিংস অসহযোগ' পথে এগোনোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। তলস্তয়ের পশাপাশি রাস্কিনের লেখা 'আন্টু দি লাস্ট' নামের বইটি ছিল তাঁর সর্বোদয় ভাবনার প্রেরণা। তলস্তয় ওরাস্কিনের পাশপাশি, আরও একজন গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শন নির্মাণে ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি হলেন, গুজরাটের জৈন সাধক রায়চন্দভাই। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে 'অনশন'-এর প্রক্রিয়ার উৎস রায়চন্দ্রভাই-এর আত্মসিদ্ধির তত্ত্ব। আবার 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স' বা 'আইন অমান্য'-র প্রেরণা পেয়েছিলেন পশ্চিমী চিন্তাবিদ থেরোর রচনা থেকে। অবশ্য আমাদের দেশে 'আইন অমান্য'র আদি পুরুষ গান্ধীজী নন। কারণ তাঁরও চারশ বছর আগে গণসংকীর্তনের মাধ্যমে আইন অমান্য করেছিলেন বাংলার বৈষ্ণব সাধক নিমাই। এককথায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলিত প্রভাবে গড়ে উঠেছিল, গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শন।

প্রায়োগিক স্তরে গান্ধীজীর রাজনৈতিক দর্শন— নির্মোহ আলোচনা

ভারতে ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গান্ধীজীর আর্বিভাবের আগেই সুনির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন বিখ্যাত ত্রয়ী লাল-বাল-পাল। কিন্তু এঁদের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মূলত সীমাবদ্ধ ছিল শহুরে বুদ্ধিজীবী ও গ্রামীণ অভিজাতদের মধ্যে। ভৌগোলিক সীমানার নিরিখেও এই আন্দোলন ছিল মূলত বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ। গান্ধীজীর নেতৃত্বেই প্রথম শহর ও গ্রামের গরীব মানুষ, শ্রমিক ও কৃষকরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। ১৯১৭ সালে বিহারের চম্পারনে কৃষকদের নিয়ে শুরু করেন সত্যাগ্রহ। ১৯১৮ সালে গুজরাটের খেড়ায় এবং আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের সংগঠিত করে শুরু করেন তাঁর অহিংস আন্দোলন।

কিন্তু প্রথম সর্বভারতীয় স্তরে অহিংস আন্দোলনের সূচনা হয় রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে। ১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল এই আন্দোলনের সূচনা হয়। ঐদিনই সারা দেশজুড়ে পালিত হয় হরতাল। বলা যেতে পারে দমনমূলক রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে ডাকা হরতালের মধ্য দিয়ে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তাপ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে নতুন ধারা, গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ—তার দ্বিতীয় ধাপ ছিল, জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন এবং খিলাফৎ আন্দোলন। এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অহিংস, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯২০ সালের ১ আগস্ট। আন্দোলনের অংশ হিসেবে পাঁচ দফা বয়কট প্রক্রিয়া চালু হয়— (১) ব্রিটিশ প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ না করা (২) নির্বাচন ও আইনসভায় অংশগ্রহণ না করা (৩) ব্রিটিশ পরিচালিত স্কুল ও কলেজের শিক্ষা গ্রহণ না করা (৪) ব্রিটিশ আইন ও আদালতের দ্বারস্থ না হওয়া এবং (৫) বিদেশী পোশাক বর্জন। এই সমগ্র পর্বে (১৯২০-২১) গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন পেশা-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষকে আবৃত করতে শুরু করে।

কিন্তু গান্ধীজীর যেমন গণ-আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেওয়ার সহজাত দক্ষতা ছিল, তেমনই তাঁর এক অদ্ভুত মানসিক বৈশিষ্টও ছিল। তা হল, যখনই তিনি মনে করতেন যে অহিংস আন্দোলন তাঁর এঁকে দেওয়া সীমাকে অতিক্রম করছে, তখনই তিনি আন্দোলনকে থামিয়ে দিতেন। রাওলাট আইন বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে ব্রিটিশরা ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনে এবং গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সহিংস বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটতে থাকে। ব্রিটিশদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে তিনি যতটা ব্যথিত হয়েছিলেন, তার থেকেও নাকি বেশী ব্যথিত হয়েছিলেন মানুষের সহিংস প্রতিবাদ প্রত্যক্ষ করে। তিনি এমন মন্তব্যও করেছিলেন— 'মানুষ আইন অমান্য করার যোগ্যতা অর্জনের আগেই আমি তাদের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলাম।'

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল চৌরি-চৌরার ক্ষেত্রেও। ১৯২২ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরের কাছে চৌরিচৌরায় কংগ্রেসের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ করা হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী ক্ষুব্ধ, আক্রান্ত মানুষ উপস্থিত ২১ জন কনস্টেবল ও ১ জন সাবইনস্পেক্টরকে পাল্টা তাড়া করলে, তারা পালিয়ে গিয়ে পুলিশ চৌকির মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য ঢুকে পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশ চৌকিতে আগুন লাগিয়ে দিলে ২২ জনই পুড়ে মারা যায়। গান্ধীজী একটি প্রত্যন্ত গ্রামের বিচ্ছিন্ন এই ঘটনাকে ট্র্যাজেডি হিসেবে বর্ণনা করে, দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। তাঁর এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত, যা সাধারণ মানুষকে হতাশ করেছিল, তার ন্যয্যতা প্রমাণের জন্য তিনি জওহরলাল নেহেরুকে লিখলেন, "এই আন্দোলন প্রত্যাহার না করলে, তা আর অহিংস থাকত না।"

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল, ১৯৩০-৩৪ দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। এই পর্বের আন্দোলনের পটভূমি ছিল ১৯২৯-৩০'এ বিশ্ব অর্থনীতির মহামন্দা। এই মন্দাজনিত কারণেই ভারতের অর্থনীতিতে কার্যত ধস্ নামে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের ধূমায়িত ক্ষোভ ও অসন্তোষকে পুঁজি করে সর্বভারতীয় স্তরে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দেন গান্ধীজী। এই পর্বের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কোন সুনির্দিষ্ট দাবি ছিল না। শুধুমাত্র 'স্বরাজ'-এর জন্য এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। লবণ আইন ভঙ্গ করারর জন্য গান্ধীজীর সবরমতি থেকে ডান্ডি অভিযান ছিল এই পর্বের সত্যাগ্রহের এক ঐতিহাসিক উপাদান। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ প্রশাসন। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের ঘটনা মানুষের ক্ষোভের গনগনে আঁচে ঘি ঢেলে দেয়। সারা দেশের হাজার হাজার নর-নারী পথে নেমে এসে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এই দুর্বার আন্দোলনে অকস্মাৎ ইতি টেনে দেন গান্ধীজী। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই ছিল। ইতিবাচক দিক হল, এই আন্দোলনগুলি প্রকৃত অর্থেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণআন্দোলনের চরিত্র অর্জন করেছিল। তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে লেনিনের বিখ্যাত কলেনিয়াল থিসিসেও এই মূল্যায়নই করা হয়। কিন্তু এর নেতিবাচক দিক হল, যখনই এই আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে তখনই সেই আন্দোলনকে প্রত্যাহার করে নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে 'Breathing Time' দেওয়া হয়েছে। গান্ধীজী এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আন্দোলন চলাকালিন সময়ে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হত— (১) এই আন্দোলনগুলি যেন একটি কেন্দ্র থেকেই পরিচালিত হয়। অর্থাৎ আন্দোলনের প্রসারের সাথে যেন সমান্তরাল বা বিকল্প একাধিক কেন্দ্র গড়ে না ওঠে, এবং (২) আন্দোলন সর্বভারতীয় চরিত্র অর্জন করলেও, তা যেন কখনই কংগ্রেস তথা গান্ধীজী নির্ধারিত পন্থা ও মাত্রাকে অতিক্রম না করে।

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।